মহাসাগরের দেশে

ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম

মোহাম্মদী পাবলিশিং কোম্পানী,
৯১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

বিষয়-সূচী

ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

বিষয়

প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

চিত্র-সূচী

ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

মহাসাগরের দেশে

ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম

মোহাম্মদী পাবলিশিং কোম্পানী,
৯১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

প্রকাশক :

মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ,

মোহাম্মদী পাবলিশিং কোম্পানী,

[illegible] আপার সারকুলার রোড,

[illegible]তা।

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ,

দাম পাঁচ সিকা

প্রিণ্টার :

মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ,

মোহাম্মদী প্রেস

৯১, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা।

ভূমিকা

স্কুলে থাকিতে নীচের ক্লাসে ছেলেমেয়েদের ভূগোল পড়ানো হয় বটে, কিন্তু সে-পঠন তাহাদের মনে পরীক্ষার বিভীষিকা জাগায় মাত্র, তাহাদের অন্তরে কোনো দাগ কাটে না। রোগী আরামের আভাস পাইয়াই যে-রকম ব্যগ্রতার সঙ্গে তিক্ত ঔষধ পরিত্যাগ করে, ছাত্র-ছাত্রীরাও অধিকাংশ স্থলে তেমনি তৎপরতার সহিত ভূগোলের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বর্জ্জন করে। ফলে, ভূগোল পরীক্ষার বিষয়ই থাকিয়া যায়, আমাদের এই পৃথিবীর পরিচয় হইয়া ওঠা তাহার ভাগ্যে ঘটে না।

যে পৃথিবীতে আমাদের বাস, তাহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা কেবলমাত্র লজ্জাকর নহে, তাহাতে আশঙ্কা এবং অসুবিধারও অন্ত নাই। জ্ঞানই শক্তির উৎস; এবং পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে পৃথিবীর সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিহার্য্য। দেশ-বিদেশের মানুষ কিভাবে কি প্রকার আবেষ্টনের মধ্যে কেমন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, প্রাকৃতিক সুবিধা-অসুবিধাকে জয় করিয়া বিভিন্ন প্রকারের সমাজ-সভ্যতা রীতিনীতি গড়িয়া তুলিয়াছে, সে-সম্বন্ধে জ্ঞান কেবলমাত্র আমাদের কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করে না; মানব-স্বভাবের চিরন্তন স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া আমাদের চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করে।

পৃথিবীর বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য ভ্রমণ-কাহিনী পাঠের মতো এত সহজ উপায় আর নাই। জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার দিক হইতে তাই ভ্রমণ-কাহিনীর এত মূল্য। পরিব্রাজকের চক্ষু দিয়া আমরা দেশ-বিদেশকে দেখিতে পাই, তাহার সুখ-দুঃখের কাহিনীতে আমাদের সহানুভূতি জাগিয়া থাকে, বিভিন্ন প্রকারের নর-নারীর সংস্পর্শে তাহার অভিজ্ঞতার বিকাশের সঙ্গে আমাদেরও অভিজ্ঞতা বিকাশলাভ করে।

বাঙ্‌লা-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, এখনো সে-সাহিত্যে ভ্রমণ-কাহিনীর স্থান ও সংখ্যা নগণ্য। বাঙালী মুসলমানের এখনো এদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই চলে। পৃথিবী এবং মানুষের সঙ্গে এ-বিরাগ নির্জ্জীব মনের লক্ষণ। প্রিয় বন্ধু ডাঃ আবুল কাসেম পৃথিবীর পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করিয়া তাই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিদেশকে পরিচিত করিবার জন্য তাঁহার এ-প্রয়াস সার্থক হউক, আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে পৃথিবীর বিষয় কৌতূহল জাগাইয়া তুলুক, এই কামনা করি।

হুমায়ুন কবির,

এম-এ (অক্সফোর্ড)

লেখকের কথা

শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে লেখার বিষয় ছিল কম এবং লেখকের সংখ্যা ছিল ততোধিক কম। তখন, কেহ লেখক হইলে সারা দেশময় তাঁহার নাম পড়িয়া যাইত।

এখন লেখার বিষয়-বস্তু বেশী, পাঠক-সংখ্যা বেশী, লেখক-সংখ্যা বেশী এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বেশী। এখন প্রগতি বা অগ্রগতির যুগ। পুরাতনে আর এখন আনন্দ নাই—সকলে চায় নূতন। মানুষ নূতনের সন্ধানে পাগল—নূতনের স্বপ্ন দেখে, নূতনের চিন্তা করে। নূতনের আহ্বানে সকলে বিভোর।

তাই এ-নূতনের যুগে কোনো কবি লিখিতেছেন—পল্লীগান, কেহ লিখিতেছেন—শ্রমের কবিতা, কেহ লিখিতেছেন—বিদ্রোহ-কবিতা, আবার কেহ লিখিতেছেন—পরিষ্কার গদ্যকাব্য। নিত্য নূতন ছন্দ ও লেখার নূতন ধরণ আবিষ্কারে এবং মৌলিকতা সংরক্ষণে এখন সবাই ব্যস্ত।

অভিযাত্রী ছুটিয়াছে মরণ বরণ করিয়া আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যে, দগ্ধ-মরু শাহারার ঊষর-বুকে, দুর্গম এভারেষ্ট-শিখরে, গভীর সাগরের তলদেশে, মহাশূন্যে মঙ্গলগ্রহের অভ্যন্তরে, অথবা দুস্তর আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে—নূতনের আহ্বানে, জ্ঞানের সন্ধানে কেহ যাইতেছে জাহাজে, কেহ ট্রেণে, কেহ মোটরে; আবার কেহবা যাইতেছে উড়োজাহাজে, বাধা-বিঘ্নহীন শূন্য আকাশমার্গ দিয়া—মহান্ সৃষ্টির বিশাল বক্ষ চিরিয়া!

যাহার অর্থ-সম্পদের অভাব, সে যাইতেছে জীবনের সাথে সংগ্রাম করিয়া পদব্রজে, বড়জোর সাইকেলে। তবুও মৃত্যু-উন্মাদ

জ্ঞান-পিপাসু অভিযাত্রীদল নিবৃত্ত হইতেছে না, দিনে দিনে অগ্রপথে আগাইয়াই চলিয়াছে সমানে।

কিন্তু হায়! এসব ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমানের স্থান কোথায়? মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে অনায়াসে অধিক শিখিবার সুযোগ পাইয়াও এখনো তাহারা শিখিবার চেষ্টা করিতেছে না—জীবন-যুদ্ধে সফলতা অর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হইতেছে না। যতটুকু করিতেছে, তাহাও ধীরমন্থরগতিতে, নিতান্ত গতানুগতিক ও মামুলী ধরণে। এমতাবস্থায়, প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে এ-জাতির পক্ষে নিজের স্থান করা সুকঠিন!

আজ এই পুস্তকে আমি শুধু ভারত-মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা হয়তো আমার অক্ষম প্রচেষ্টা; তথাচ, যেহেতু কোন মুসলমান লেখক ইতিপূর্ব্বে এই রহস্য পরিপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জের বিবরণ লেখার চেষ্টা করেন নাই, তাই আমার এই উদ্যম। এই ভ্রমণ-কাহিনী মাসিক 'মোহাম্মদী'তে ইতিপূর্ব্বে ধারাবাহিকভাবে চিত্রশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক মহোদয়কে এজন্য অশেষ ধন্যবাদ!

দৌলতপুর, খুলনা,
বৈশাখ ১, ১৩৪৪ সাল।

আবুল কাসেম

★

আমার প্রাচ্য-ভ্রমণের সহযাত্রী
বন্ধু, গবর্ণমেণ্ট কন্‌ট্রাক্টর মিঃ এম. আবু
বকর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কল্যাণীয়া বেগম
মেহেরুন্নিসার করকমলে 'মহাসাগরের
দেশে' উপহার প্রদত্ত হইল…

—লেখক

★

উপহার

বিষয়-সূচী

ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

বিষয়

প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

চিত্র-সূচী

ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

চিত্র		পৃষ্ঠা

মহাসাগরের দেশে

ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

মহাসাগরের দেশে

মার্চ্চ ৬, ১৯৩২। আমি ও বন্ধু মিঃ বেকার কলিকাতা আউটরাম ঘাট হইতে এরোণ্ডা জাহাজে আরোহণ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে সাগর-পারের দেশে রওয়ানা দিলাম। বন্ধুবর মিঃ ইব্রাহিম ও মিঃ ওয়াহেদ আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া সাশ্রুনয়নে বাসায় ফিরিলেন। আমরাও বিদায় লইয়া দূর-ভবিষ্যতের কতই না ছিন্নসূত্র ও অসংলগ্ন কল্প-চিত্র মানস-পটে আঁকিয়া যাইতে লাগিলাম,—আর, বিরাট অর্ণবপোত ক্রমাগত গঙ্গাগর্ভ দিয়া সীমাহীন সমুদ্রপানে আগাইয়া যাইতে লাগিল।

কলিকাতা

মহাসাগরের দেশে

আমাদের চিন্তা-রাজ্যের অফুরন্ত স্বপন-কাহিনী সহস
গতিভ্রষ্ট হইল—আহারের সঙ্কেতজ্ঞাপক ঘণ্টা-ধ্বনিতে
আহারাদি সমাপ্ত করিয়া নানা সৃষ্টিছাড়া অলীক ভাবধারার
মধ্যে আবার ডুবিলাম এবং অজ্ঞাতসারে শয্যাপরে সুপ্তির
কোলে ঢলিয়া পড়িলাম।

নিদ্রা ভাঙ্গিলে মুখ হাত ধুইয়া, জাহাজের রেলিং পার্শ্বে
বাহিরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলাম। তখনো আমাদের
বাষ্পীয় যান উদার-উন্মুক্ত সাগরবক্ষে পতিত হয় নাই।
আমরা দেখিতে লাগিলাম, বহুসংখ্যক শ্বেতবর্ণের
সাগর-চিল জাহাজের পিছনে পিছনে উড়িয়া, কখনো বা
হাঁসের মত সাঁতার কাটিয়া, মহাসাগরের প্রথম নৈকট্য-
সূচনা করিয়া আসিতেছে। ক্রমে, জলের ঘোলা রঙ
সবুজ হইয়া গেল। চারিদিকে সবুজের স্রোত প্রবাহিত
হইতেছে; কোন্ সময় যে ঘোলা জল-রাজ্য অন্তর্হিত
হইয়া দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজদেশের সীমান্তে—কূল হইতে
অকূল সাগরে আসিলাম, তাহা সম্যক উপলব্ধি করা
গেল না। কয়েক নিমেষ আগের সেই বিশাল ঘোলা
জলরাশির লেশও যেন ইহার অগ্র-পশ্চাতে কোথাও
কখনো ছিল না; যেন চোখের সামনে এই সবুজ জলের
খেলা-ই আজীবন খেলিতেছিল। স্বর্ণকুমারীর ভাষায়ঃ

মহাসাগরের দেশে

সাগর-চিল
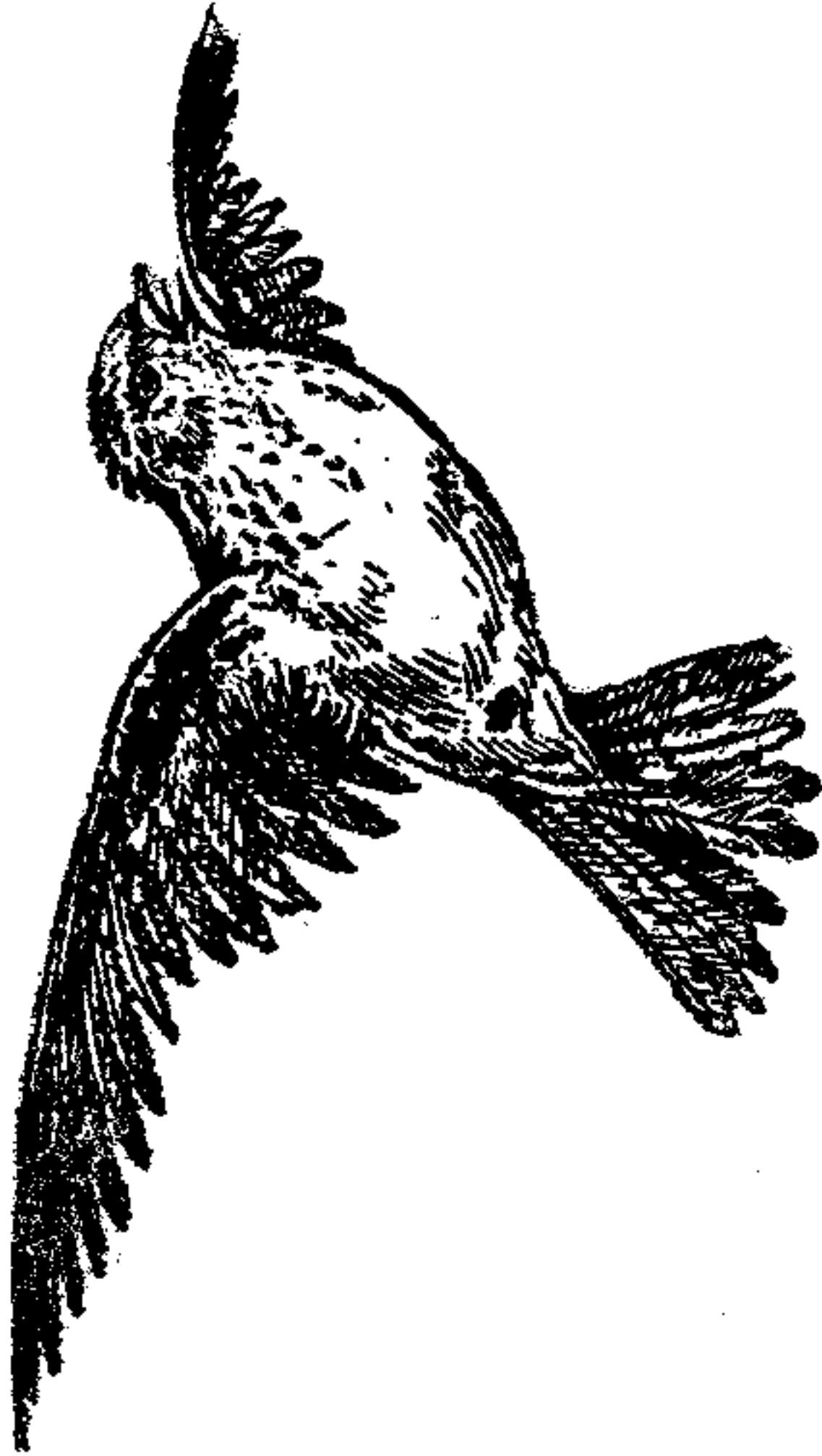
'পুরুষের নূতন প্রেমে পুরাতন প্রেম কিরূপে বিলীন হইয়া যায়, ইহা তাহার একটী সুদৃষ্টান্ত।'

সত্যই আমরা এখন অকূল পাথারের যাত্রী। সাগরের জল এখন আর সবুজ নহে, গাঢ় নীল জল-রাশির সহিত জাহাজের ঘূর্ণায়মান চালক-চক্র (Propeller)-এর সংঘর্ষ-সংঘাতে ভীষণ তরঙ্গোচ্ছ্বসিত শ্বেত-ফেনা ঊর্দ্ধে উঠিয়া পরক্ষণে সুনীলে মিলাইয়া যাইতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে—কেবল অতল অফুরন্ত বারিধি, মুক্ত আকাশ, আর, সীমাহীন যাত্রা!

মার্চ্চ ৮। রেঙ্গুন জেটিতে জাহাজ ভিড়িল। দূর হইতে শহরের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ঘোলা জল, সবুজ বিটপীশ্রেণী, আর গাছের ফাঁকে ফায়াগুলি ভারি চমৎকার দেখিতে। হঠাৎ জাহাজের মধ্যে ঘন ঘন রব শোনা যাইতে লাগিল—কোরাণ্টাইন, কোরাণ্টাইন। ব্যাপারটা বুঝিতে মোটেই বিলম্ব হইল না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে শ্রীকান্তর আরাকান ভ্রমণে কোরাণ্টাইন-পর্ব্ব পড়িয়াছিলাম।

জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করিলে ব্রহ্মের কাষ্টম অফিসারগণ প্রত্যেক যাত্রীর আস্‌বাব-পত্র পরীক্ষা করিয়া ছাড়িতে লাগিলেন। কাষ্টম প্রহসন শেষ হইলে আমরা

সটান জেনারেল পোষ্ট অফিসে গিয়া বাল্যের সতীর্থ মিঃ শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দীর্ঘকাল পরে অতর্কিতভাবে দেখা হওয়ায় তিনি যুগপৎ বিস্ময়-আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শরৎ ও আমি ছাত্র-জীবনে একবার আগ্রা পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। সে অনেকদিনের কথা। তারপর, ছাত্রজীবন পার হইয়া কর্ম্মজীবনের ধাক্কায় ঘুরপাক খাইতে খাইতে বন্ধুবর ডাক-বিভাগে কর্ম্ম লইয়া দূর-প্রবাসে স্থিতি করিয়াছেন।

রেঙ্গুন

পরদিন একসঙ্গে আমরা শহর পরিভ্রমণ করিলাম—পাহাড়ে অবস্থিত স্যুয়েড্যাগোন প্যাগোডা দেখা হইল। বার্ম্মিজরা এখানে উপাসনা করে। সাধারণতঃ ইহা ফায়া নামে অভিহিত। বড়-ছোট বহুসংখ্যক ফায়া—তাহার মধ্যে শ্বেত-মার্ব্বেল নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি। মধ্যস্থলে বড় ফায়া—তাহার উপরে উঠা যায় এবং অভ্যন্তরে প্রবেশেরও সুড়ঙ্গপথ আছে। দ্বারদেশে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও গহ্বরমাঝে ভয়ানক অন্ধকার বলিয়া তাহার ভিতর আমাদের ঢুকিতে সাহস হইল না। ফায়ার আশে পাশে বসিয়া বহু লুঙ্গি পরা নারী-পুরুষ করজোড়ে প্রার্থনা করে। রেঙ্গুনে অনেকগুলি প্যাগোডা আছে,

সবগুলি সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকের জন্য উন্মুক্ত ; তবে, ভিতরে ঢুকিবার পূর্ব্বে জুতা বাহিরে রাখিয়া যাইবার নিয়ম।
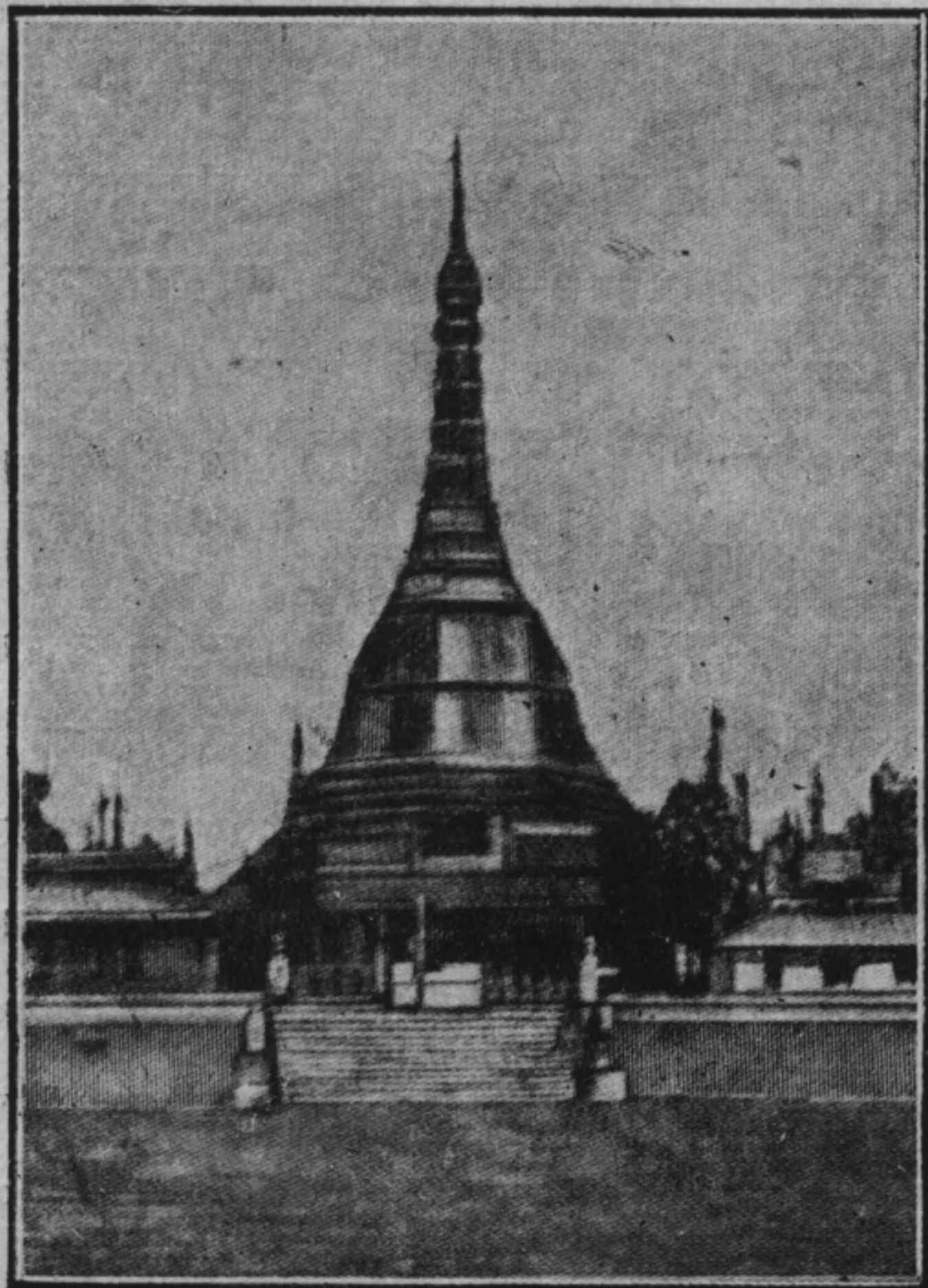
প্যাগোডা

অতঃপর, একে একে হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়াট, ড্যালহাউসি পার্ক, রয়্যাল লেক, ভিক্টোরিয়া লেক, জু',

ক্যাণ্টোনমেণ্ট, গার্ডেন, বাজার, ৩০´ ফুট দীর্ঘ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিলাম।

রেঙ্গুনের একটা বিশেষত্ব—এখানকার বড় বড় দালানেরও ছাদ টাইল দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উপরে উঠিবার সিঁড়ি একদম খাড়াই। বোধ হয়, জমির মূল্য অত্যন্ত বেশী বলিয়া এরূপ। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বমান রাস্তা মাত্র পাঁচটী—যথাক্রমে, ষ্ট্রাণ্ড রোড, মার্চ্চেণ্ট ষ্ট্রীট, ড্যালহাউসি ষ্ট্রীট, ফ্রেজার ষ্ট্রীট এবং মণ্টেগোমারী ষ্ট্রীট। ইহা ব্যতীত, প্রায় রাস্তাগুলি সংখ্যাজ্ঞাপক—যথা, ৪২ ষ্ট্রীট, ৩৫ ষ্ট্রীট ইত্যাদি।

সমস্তদিন আমরা ইতস্ততঃ ঘোরা-ফেরা করিয়া রাত্রে একখানা ল্যাঞ্চায় (Rickshaw)উঠিয়া সুহৃদ্বরের বাসায় উপস্থিত হইলাম। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া নানা কথোপথনের পর শুইয়া পড়িলাম। পরদিন মার্চ্চ ১০, রেঙ্গুন রেল-ষ্টেশন হইতে ট্রেণযোগে আপার বার্ম্মার মান্দালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। দুইদিনের মধ্যে তথাকার স্বর্ণমন্দির, দারুশিল্প, প্যাগোডা, হস্তী ধরার খাদা, পোষা হস্তীর মেলা, ব্রহ্মের পূরাতন রাজধানী অমরাপুরার ঘণ্টা, প্রোমের দ্রষ্টব্য, হেনজাদা, চাঙ্গিন প্রভৃতি জিলার দর্শনীয় দেখিয়া রেঙ্গুন ফিরিয়া আসিলাম।

মার্চ্চ ১১। আমরা শরৎবাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া হোয়ার্ফে পৌঁছিলাম। একজন কর্ম্মচারী আমাদের
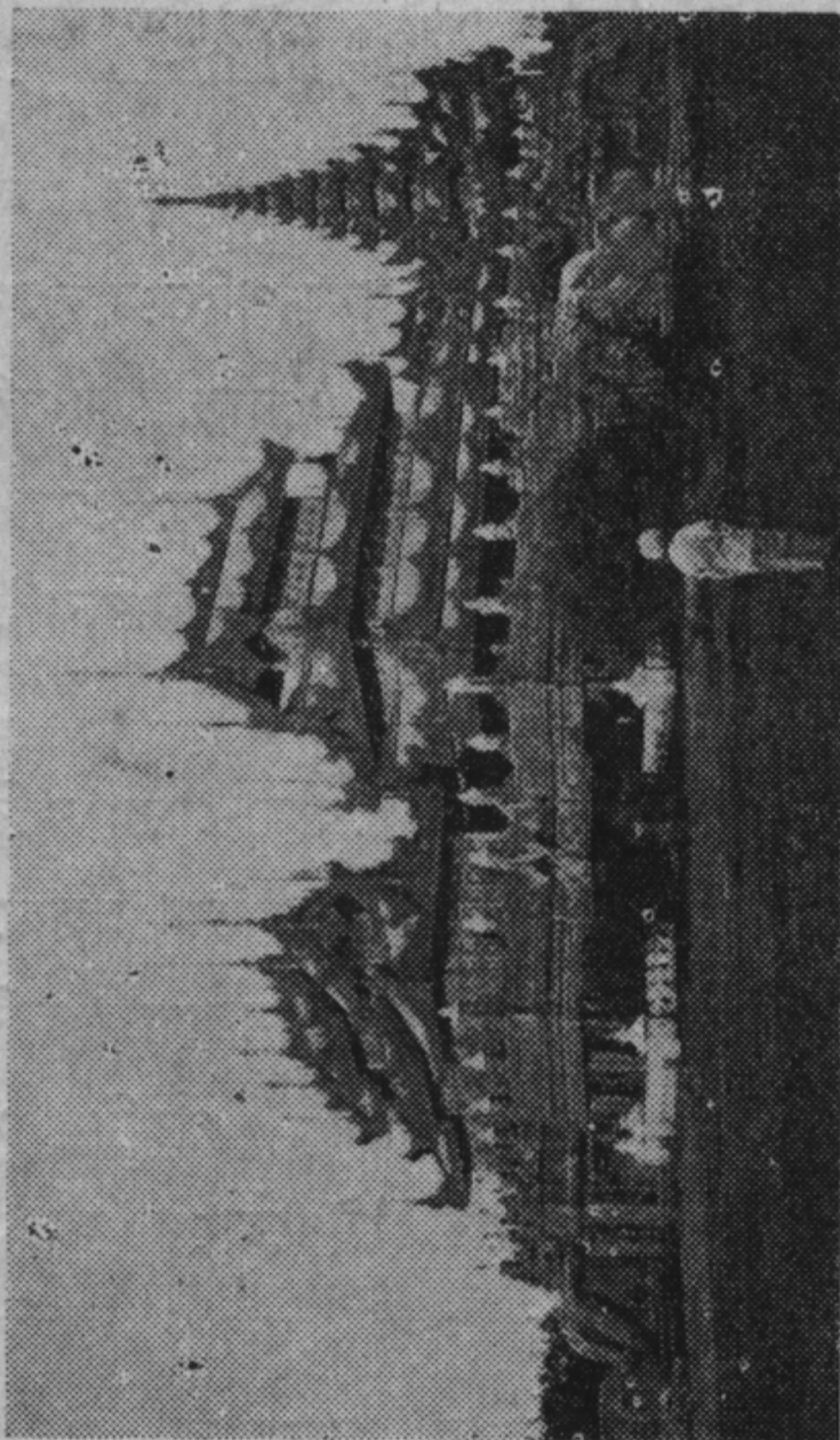
মান্দালয়ের স্বর্ণমন্দির

শরীরে বসন্তের প্রতিষেধক টীকা দিয়া দিলেন। তারপর, ডাক্তার আসিয়া আরোহীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিলেন। বেলা ৩টার সময় কোম্পানীর লঞ্চ আসিল,

আমরা উঠিয়া পড়িলাম। খানিকপরে আরোহীগণকে লইয়া ক্ষুদ্র ষ্টীমারখানা নদীগর্ভে অবস্থিত জাহাজের গাত্র-সংলগ্ন সিঁড়ি স্পর্শ করিল ; আমরা একে একে ভিতরে

ব্রহ্মের পুরাতন রাজধানী অমরপুরার বৃহৎ ঘণ্টা

ঢুকিয়া পড়িলাম। আমাদের পোতখানার নাম এস-এস টাইরিয়া। পাঁচতলা জাহাজ, খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তৈলের ষ্টীমে ইহার এঞ্জিন চলে এবং ৮,০০০ হাজার টন

মাল বহন করিতে সমর্থ; প্রকাণ্ড ৬০´ ফুট ৩´´ ইঞ্চি। ইহা শতাধিক কর্ম্মচারীসহ তিনহাজার প্যাসেঞ্জার বহন করিবার ক্ষমতা রাখে। স্ত্রী, পুরুষ ও পাগলের জন্য তিনটী ভিন্ন ভিন্ন হাসপাতাল এবং জলাশয়, টেনিস-গ্রাউণ্ড, বিশ্রাম-ঘর ইত্যাদিও আছে।

প্রায় চারিটার সময় জাহাজ ছাড়িল। ইরাবতী গর্ভ দিয়া 'টাইরিয়া' ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। অসংখ্য 'সাম্পান' ক্রমে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যাইতে লাগিল; হঠাৎ ইংলিস্তান ও সুলতানিয়া জাহাজদ্বয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ইহাদের মালিক রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙ্গালী 'মার্চ্চেণ্ট প্রিন্স' আবদুল বারী চৌধুরী। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বিদেশী কোম্পানীর সহিত তাঁহার বেঙ্গল-বর্ম্মা-ষ্টীম-নেভিগেশন কোম্পানীর প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছেন। কর্ম্মজীবনে তিনি আদর্শ ব্যবসায়ী, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের জাহাজ ক্রমে সাগরের মুখে পড়িতেই ঈষৎ নাচিয়া উঠিল, পরক্ষণে তাহার গতিবেগ বাড়িয়া নীল-কালো গভীর জলধি-বক্ষ চিরিয়া ঘণ্টায় ১৭ মাইল বেগে চলিতে লাগিল। সমুদ্র-পক্ষীরা এখন জাহাজের পশ্চাৎ অনুসরণ বন্ধ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে, আস্তে আস্তে লাইট-

হাউসগুলিও অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। শুধু মাঝে মাঝে দেখা যাইতে লাগিল, ছোট ছোট পাল-খাটানো

লাইট-হাউস

জাহাজ সাগর মধ্যে ভাসিতেছে। সেগুলি প্রাচীন-

ফ্যাসানে প্রস্তুত, সম্ভবতঃ ধীবরগণ তাহাতে উঠিয়া মৎস্য শিকার করে।

তারপর, যখন ভারত মহাসাগরে পড়া গেল, তখন নিশাদেবী তাঁহার গাঢ় কৃষ্ণপর্দ্দাখানা দিগন্তে বিস্তৃত করিয়া ধরণীর বক্ষ আবৃত করিয়া দিয়াছেন। অসীম নীল আকাশে লক্ষ-কোটী তারকা মিট মিট করিয়া হাসিতেছে, আর, অতল সলিল মাঝে ফস্ফোরাস একবার জ্বলিতেছে, একবার নিবিতেছে। সে কী নয়নাভিরাম দৃশ্য! আমরা ডেক-চেয়ারে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহাসাগরের নীরব মৌনতা ও যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অশ্রুরাশি যুগপৎ স্তব্ধ-পুলকে দেখিয়া যাইতে লাগিলাম। লবণ-সাগরের অপূর্ব্ব-অফুরন্ত লহর-নাচন বাস্তবিক অব্যক্ত তৃপ্তিপ্রদ!

প্রত্যূষে সূর্য্য-উদয় দেখিলাম। একখানা বিরাট সুবর্ণগোলক ধীরে ধীরে বারিধির বক্ষ চিরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল,—ক্রমে, তাহার রশ্মিধারায় সমগ্র ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা প্রাতঃক্রিয়া শেষ করিয়া আবার ডেক-চেয়ারে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম—বহু দূরের ধূসর-ধূমময় অভ্রভেদী পাহাড়ের দৃশ্য! কখনো দেখিলাম, সামুদ্রিক উড্ডীয়মান মৎস্য তাহার কালো পাখা বিস্তার করিয়া একস্থান হইতে উড়িয়া অন্যস্থানে যাইতেছে,

আবার কখনো দেখিলাম, বৃহৎ বৃহৎ সাপ সমুদ্র পাড়ি দিয়া এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ের দিকে যাইতেছে।

উড্ডীয়মান মৎস্য

সে কী ভীতিপ্রদ এবং ভীষণ-দর্শন সাপ! শুনিলাম, সমুদ্র-পাহাড়ে জন-মানব বাস করে না, বাস করে শুধু

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফণীরাজ। জাহাজ থামিল না, দিবারাত্রি সমানভাবে চলিতে লাগিল। আমরা একবার অর্ণবীয় মাইল-মিটারে দেখিয়া আসিলাম, এ-পর্য্যন্ত জাহাজ রেঙ্গুন হইতে ৭০০ মাইল আসিয়াছে। সিঙ্গাপুর পৌঁছিতে

সমুদ্র-পাহাড়

এখনো ৯০০ মাইল বাকী। কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনের দূরত্ব ৭৭৬ মাইল।

জাহাজের গানার মিঃ তাহের বড় ভালো লোক। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সহিত খুব ভাব হইল। তিনি আমাদের স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

প্রত্যহ চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁহার ইলেকট্রিশিয়ান বন্ধু মিঃ এস. কুণ্ডুর ক্যাবিনে লইয়া রেকর্ড-সঙ্গীত শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অনেক সময় জলযোগও করিতে হইত। তাঁহার মাতৃভাষা উর্দ্দু, সুতরাং আলাপ করিতে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। উর্দ্দু দুই এক সময় বলিতে নিষ্ফল চেষ্টা করিতাম, তাহা শুনিয়া ভদ্রলোক নিতান্ত বালকের মতোই হো হো করিয়া হাসিতেন; আমরা অসহায়ের মতো অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতাম। নিশীথ চাঁদিনী রাতে তিনি আমাদের সহিত জাহাজের উপর গিয়া বসিতেন—গল্প করিতেন। বহু দূরে ধাবমান আলোকমালায় সুসজ্জিত দুই একখানা জাহাজ দেখাইতেন; তাহার কোনোখানা অষ্ট্রেলিয়া, আবার কোনোখানা জাভা প্রভৃতি দূর-গন্তব্যস্থানে যাইতেছে। সমুদ্রে উত্তাল-তরঙ্গ ছিল্ না, বা তাহার খর প্রবাহের ভয়াবহ রব ঝড়ের পূর্ব্বক্ষণে আসন্ন মেঘ-গর্জ্জনের মতো প্রতিনিয়ত দিগ-দিগন্তে প্রতিধ্বনিতও হইতেছিল না। কাজেই, আমরা দীর্ঘ অপ্রীতিকর অবসর-সময়টা গগনপানে চাহিয়া ও গল্পগুজব করিয়া কাটাইবার প্রয়াস পাইতাম।

মার্চ্চ ১৫। সকালে পেনাং পোঁছিলাম। দূর হইতে

পর্ব্বত-ঘেরা শহরের দৃশ্য অতি মনোলোভা! শুনিলাম, এখানে মাল-পত্রাদি উঠা-নামা করিতে সাত-আট ঘণ্টা সময় লাগিবে। অতএব, এই সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া আমরা অবিলম্বে ক্যাপ্টেন বা কমাণ্ডারের অনুমতি লইয়া কোম্পানীর ষ্টীমারযোগে তীরে নামিলাম। সুন্দর শহরে সুন্দর পথ। পথের কোথাও একটু ময়লা নাই, সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—একেবারে নিখুঁত।

পেনাং

আমরা ট্রামে উঠিয়া হিল্-ষ্টেশনের টিকিট ক্রয় করিলাম। শহরের একপ্রান্ত দিয়া লক্ষ লক্ষ নারিকেল, সুপারি ও রবার বৃক্ষের সারি ভেদ করিয়া ট্রাম ছুটিল। হিল্-ষ্টেশন হইতে বৈদ্যুতিক গাড়ী চড়িয়া পার্ব্বত্যপথে এবং সুড়ঙ্গ (Tunnel) অতিক্রম করিয়া প্রায় আড়াই হাজার ফিট খাড়াই পাহাড়ে উঠিলাম। যাতায়াতের ভাড়া স্বরূপ এজন্য মাথাপ্রতি ১০০ সেণ্ট্ খরচ হইল। পাহাড়ের উপর হইতে শহরের দৃশ্য সুন্দর ছবির ন্যায় দেখায়। আমরা পাহাড়ের উপর ইতস্ততঃ ঘোরা-ফেরা করিলাম, গিরি-কুটির-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা করিতে দেখিলাম। সে কী নির্ম্মল আনন্দ! শহরের মাঝে ভীষণ গরম, আবার পাহাড়ের

উপর ঠিক তাহার বিপরীত। ঝির্ ঝির্ করিয়া মলয়-সমীর বহিয়া যাইতেছে, বাতাসের প্রবাহে ফল-ফুলের

পেনাং হিল্ রেলওয়ে

গাছগুলি মৃদু মন্দ দুলিতেছে-হেলিতেছে। সে কী
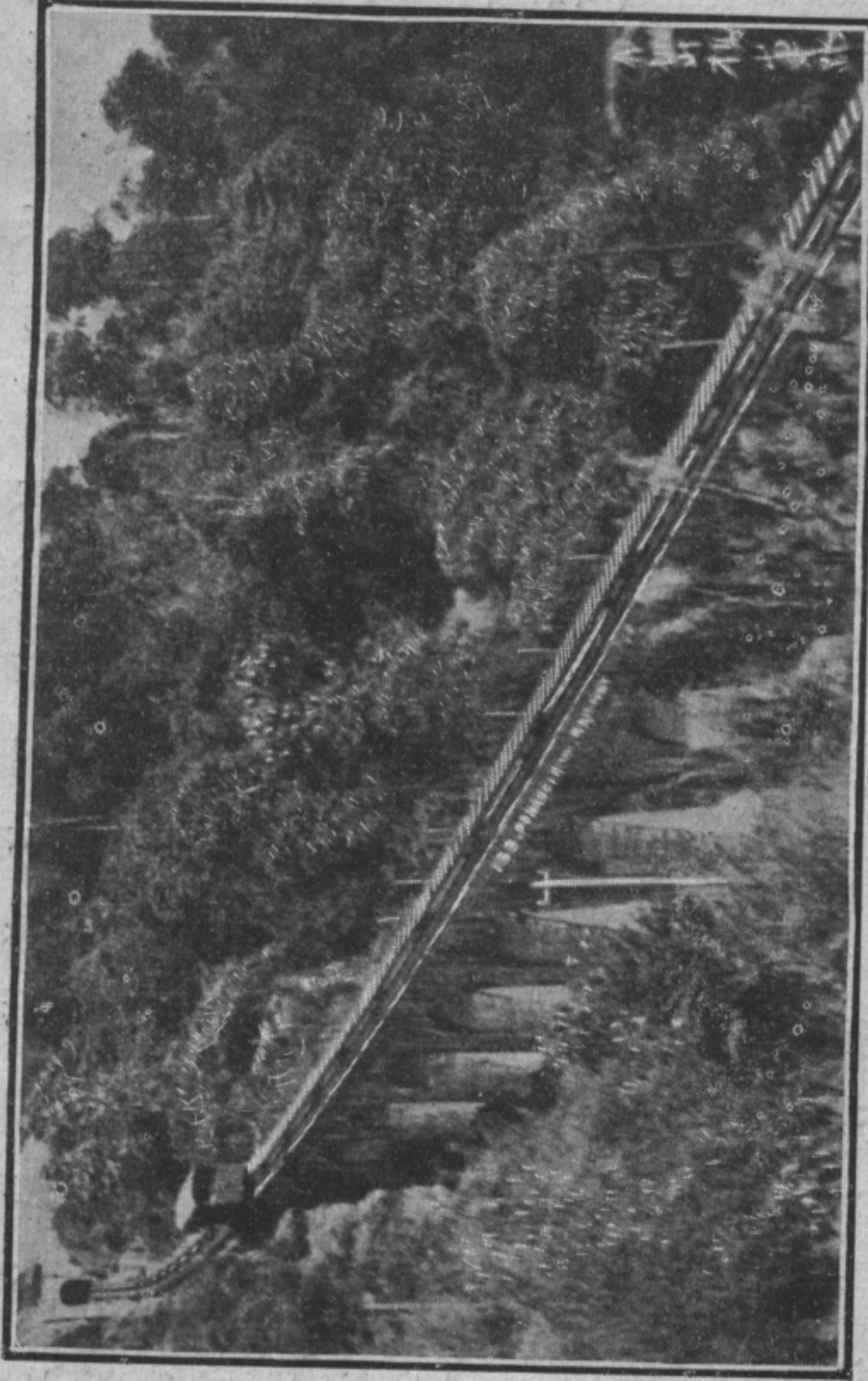
নয়নলোভন দৃশ্য ! মনে হয় যেন কোন্ স্বপ্ন-রাজ্যে উপনীত হইয়া তন্ময়চিত্তে বিচরণ করিতেছি।

অনেকক্ষণ পরে আমরা হিল্ রেলগাড়ীতে আরোহণ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম। এই রেলপথ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দ্রষ্টব্য এবং বৈজ্ঞানিকের উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইহার উচ্চতা ২,৪৭৬´ ফিট। বাস্তবিক স্বচক্ষে দর্শন না করিলে ইহার চমৎকারিত্ব ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা বৃথা !

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আমরা আবার শহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং একখানা সুদৃশ্য মোটরে উঠিয়া সর্প-মন্দির দেখিতে যাত্রা করিলাম। সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাস্তা ধরিয়া মোটর বিপুলবেগে চলিতে লাগিল।...

সর্প-মন্দির বাস্তবিক দেখার জিনিস। এই মন্দিরের ভিতর ১০´-১১´ ফিট দীর্ঘ অগণিত সাপ আপন মনে বিচরণ করিতেছে। মানুষের সংস্পর্শে থাকিয়া ইহারা চিরদিনের জন্য হিংসা-বৃত্তি পরিহার করিয়াছে। দর্শকগণ দুধ-কলা দিলে সাপগুলি গৃহপালিত পোষা জীবের মতো সে-সব আহার করে। এই দৃশ্য দর্শনে অন্তর-মাঝে সত্যই এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। সর্প-মন্দির দেখা শেষ করিয়া আমরা শহরের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘোরা-ফেরা
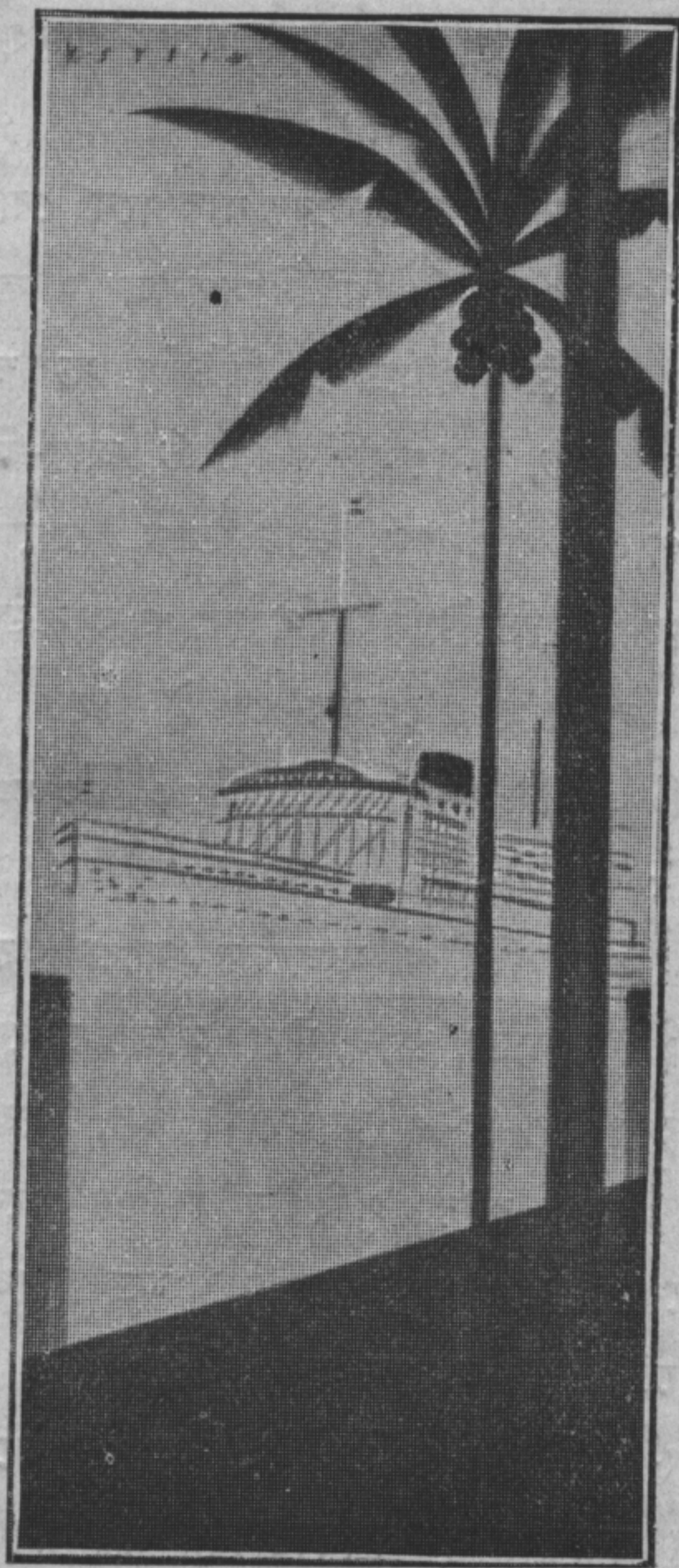
পেনাং বেলাভূমি

করিলাম। শহরের প্রান্তস্থিত মালয়দের গ্রামগুলি ছবির মতোই সুন্দর দেখাইতেছিল।

অতঃপর, আমরা অল্প সময়ের ব্যবধানে বোটানিক্যাল গার্ডেন, কর্ণওয়ালিস দুর্গ, মিউনিসিপ্যাল অফিস, টাউন হল, সুপ্রীম কোর্ট, লাইব্রেরী, ফিটজিরাল্ড স্মৃতি-সৌধ, সেণ্টজর্জ্জেস্ চার্চ্চ, ক্যাথোলিক চার্চ্চ আর-সি কলেজ, ওয়েস্বলী পার্ক, মাতৃসদন, লাট ভবন, জেনেরাল হাসপাতাল, বাজার, ভিক্টোরিয়া পিয়ার ও ফান ফ্রলিক পার্ক দর্শন করিয়া লইলাম। পেনাং-এর ট্রামওয়ে কোম্পানীর নাম জি-টি-এম-টি অর্থাৎ George Town Municipal Tram Way. পেনাং-এর লোকসংখ্যা—১,৪৯,৩২৭ এবং ব্রিটিশ মালয়ের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ-নগরী। সুমাত্রা, শ্যাম, উত্তর মালয় হইতে যে-সমস্ত টিন ও রবার পেনাং-এ আমদানী হয়, তাহা অতঃপর এখানকার বন্দর হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রফ্তানী হইয়া থাকে। এখানে ভারতীয় মুদ্রা চলে না এবং ডাক-টিকিটের উপর ব্যাঘ্রের ছবি অঙ্কিত হয়।

পেনাং-এর ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত দিতে গেলে ক্যাপ্টেন স্যর জেম্স্ ল্যাঙ্কাষ্টারের নাম সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে। তিনি ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থান আবিষ্কার করেন

এবং কেদা'র অধিপতি পরে ইহা ৬,০০০ ডলারের পবিবর্ত্তে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে দান করেন।
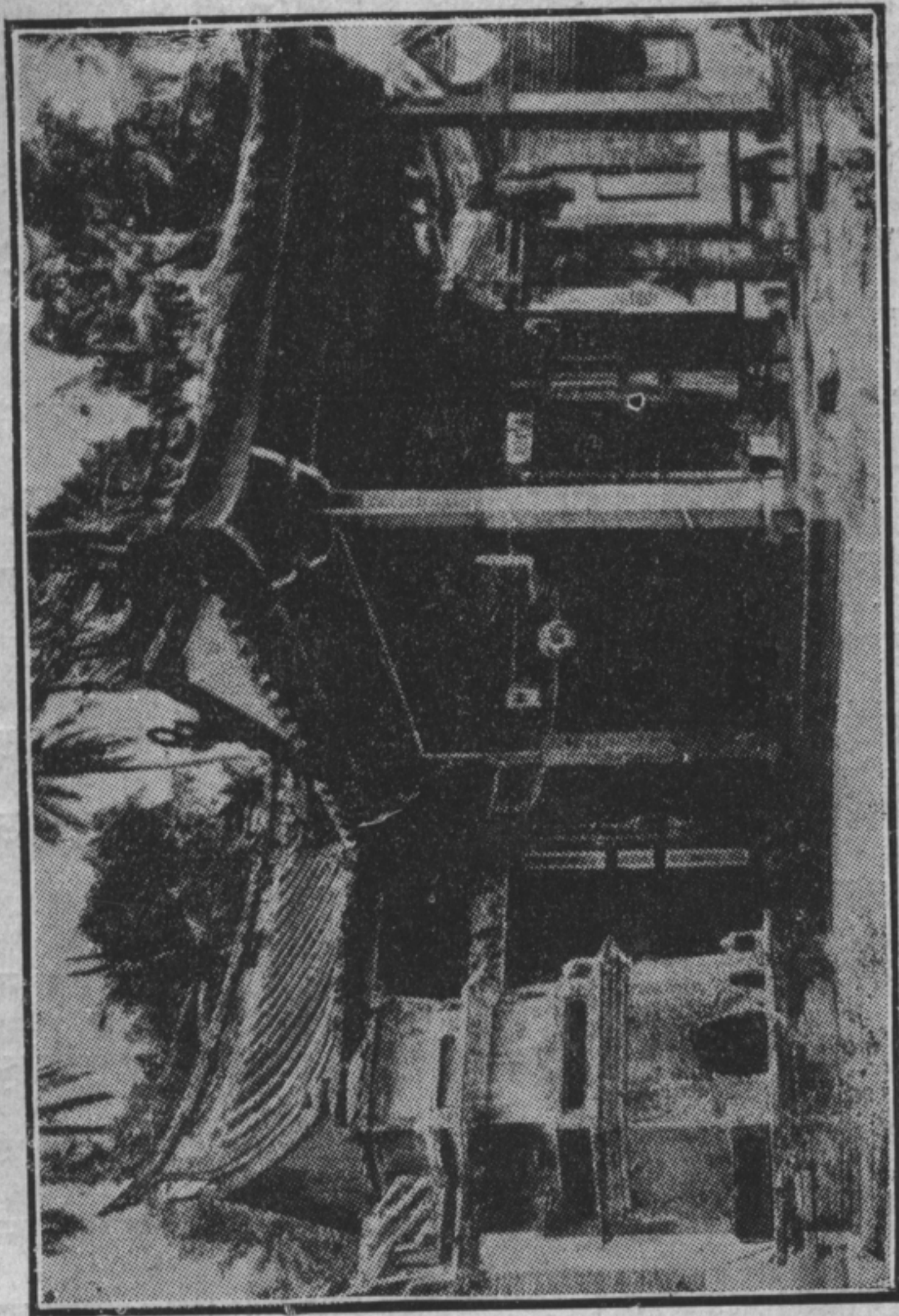
পেনাং সর্প-মন্দির

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট যখন ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস

লাইট বর্ত্তমান এস্‌প্লানেড নামক স্থানে মাত্র একশত সৈন্য লইয়া অবতীর্ণ হন, তখন হইতে পেনাং ব্রিটিশাধিকারে আসে। ১২ই আগষ্ট যুবরাজের জন্মদিনে ঐ দ্বীপের নাম প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ রাখা হয়।

পেনাং-এর পরবর্ত্তী ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দ্বীপ হইতে একটী রেলপথ অধুনা দক্ষিণে আলোরষ্টার হইয়া সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত এবং উত্তরে শ্যাম-রাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্কক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পেনাং হইতে মোটরযোগে ইটাম-এর চীনা-মন্দির (ড্রাগোন), জলপ্রপাত, উদ্যান এবং গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া ট্যাণ্ডজঙ্গ-বাঙ্গা ভ্রমণ বিশেষ উপভোগ্য।

পেনাং-এর কয়েকটী প্রসিদ্ধ রাস্তা যথাঃ বার্ম্মা রোড, ম্যাকালিষ্টার রোড, পেরাক রোড, নিউ কোষ্ট রোড, ইয়োর্ক রোড আর্জ্জাইল রোড এবং ওয়েষ্টার্ণ রোড।

আমরা কারেন্সী অফিস হইতে খরচের জন্য কয়েকখানা নোট ভাঙ্গাইয়া ডলার করিয়া লইলাম। জেটিতে পৌঁছি-বার পূর্ব্বে শেষবারের মতো পাহাড় হইতে পেনাং ও প্রধান নগরের মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সুন্দর দৃশ্য নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা ইহাকে 'প্রাচীর মুক্তা'—the Pearl of the East বলিয়া থাকেন।

যথাসময় জাহাজে উঠিয়া শহরের দিকে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল, কমাণ্ডার জাহাজ ছাড়িবার হুকুম দিলেন। জাহাজ আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিল—ক্রমে, শহরের দৃশ্য অস্পষ্ট-ঝাপ্‌সা হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। মহাসাগরের অসীম জলরাশি ভেদ করিয়া জাহাজ ক্রমাগত আগাইয়া চলিতে লাগিল।

পরদিন পোর্ট সোয়েটেনহাম-এ জাহাজ ভিড়িল। আমরা কামাণ্ডারের আদেশ লইয়া শহর দেখিতে যাত্রা করিলাম। জাহাজ ছাড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা আগে জেটিতে পৌঁছিবার জন্য তিনি উপদেশ দিলেন।

পোর্ট সোয়েটেনহাম নূতন শহর হইলেও বেশ সুরুচিসম্পন্ন। ষ্ট্রেটস্ সেট্‌লমেণ্টস্-এর গবর্ণর স্যর ফ্রাঙ্ক সোয়েটেন্‌হাম তাঁহার নিজের নামে এই নগরের নামকরণ করেন। শহরটী ছোট হইলেও ইহার সমস্ত রাস্তা আশ্‌ফ্যাল্ট-মণ্ডিত, বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে চৈনিকদের সংখ্যা অধিক—তাহারা অধিকাংশই শ্রমজীবী। কেহ জিন্‌রিক্‌শ' টানে, কেহ রাস্তা ঝাট দেয়, কেহ মোট বহন করে, আবার কেহ

পোর্ট সোয়েটেন্‌হাম

কেহ ইক্ষুর চাষ করে। শহরের চতুর্দ্দিক গভীর অরণ্য—তাহার অভ্যন্তরে বাঘ, সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ার সর্ব্বদা বিচরণ করে।

বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সমুজ্জল এই শহরটীতে হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, বাজার, স্কুল প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহাও পৃথিবীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বন্দরে পরিণত হইবে, ইহার অবস্থান দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায়। ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটের রাজধানী কুয়ালালমপুর এবং পোর্টসোয়েটেনহাম রাজ্যের দ্বিতীয় শহর।

জাহাজে পৌঁছিলাম। সময় হইল, কমাণ্ডার ঘণ্টা-ধ্বনি করিলেন, জাহাজও প্লাটফরম হইতে দূরে সরিতে আরম্ভ করিল; তারপর ঘণ্টায় ১৮ মাইল বেগে অনন্ত নীল জল চিরিয়া অর্ণবযান সন্মুখে ছুটিয়া চলিল।

দুইদিন পরে সিঙ্গাপুর বন্দরে জাহাজ পৌঁছিল। কোরাণ্টাইন করিবার নিমিত্ত সিঙ্গাপুর পুলিস ডেক-যাত্রীদের ষ্টীমারে উঠাইয়া সমুদ্র মধ্যস্থিত কোরাণ্টাইন দ্বীপে লইয়া গেল। আমার পাস্‌পোর্টে নামের পূর্ব্বে চিকিৎসক লেখা থাকায়

সিঙ্গাপুর

কোরাণ্টাইনপর্ব্ব নামক অগ্নি-পরীক্ষা হইতে কোনরকমে মুক্তি পাইলাম।

তাহার পর আরম্ভ হইল কাষ্টম-পর্ব্ব। এখানে তামাক, মদ্য ও অহিফেন ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের উপর 'কাষ্টম-ডিউটি' বা বাণিজ্য-শুল্ক ধরা হয় না। তথাচ, কাষ্টম পুলিস আসিয়া যাত্রীদের জিনিস-পত্র, বাক্স-পেটরা, বিছানা-বালিশ—এমন কি, জুতার সুকতলার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত তল্লাশী করিয়া তবে ছাড়ে। আমাদের জিনিস-পত্রের মধ্যে কোন-কিছু আপত্তিজনক না থাকায় শীঘ্র অব্যহতি পাইলাম।

সুতরাং দেরী না করিয়া রেল-মোটরে আরোহণ করিয়া শহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু মিঃ এ, আর নেজাম, বি-এ (কলিকাতা), এম-এস সি (ওয়াশিং), এফ-আর-এ-এস (লণ্ডন) মহোদয়ের শ্বশুর মিঃ মোহাম্মদ আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং ১, জালান বেসার-এ থাকার জায়গা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই স্থানটী সাতটি প্রসিদ্ধ রাজপথের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত। রোচোর ক্যানাল রোড, বেনকুলিন ষ্ট্রীট, সংগি রোড, জালানবেসার প্রভৃতি

রাস্তা কয়টি বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া এই স্থানে মিলিয়াছে।

সিঙ্গাপুর-এর ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এইরূপ : প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায় যে, সুমাত্রা দ্বীপের প্যালেম্বাং পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি মালয়বাসী ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গাপুর-এ উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে জোহোরের সুলতান ইহা ক্যাপ্টেন হ্যামিলটকে বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং উপনিবেশ স্থাপনের জন্য দান করেন। হ্যামিল্টনও ইহা বাণিজ্যের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত করেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কা ও রিও দ্বীপে ওলন্দাজগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। তদানীন্তন সুমাত্রায় বেন্‌কুলি-নের মাননীয় গবর্ণর ঐ শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ ব্রিটিশ শাসন-পরিষদের নিকট উপস্থিত হন এবং এই দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থান অধিকার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী স্যর ষ্ট্যামফোর্ড র‍্যাফেল্‌স্ জোহোরের যাবতীয় শক্তির সহিত প্রয়োজনীয় সন্ধি করেন এবং সিঙ্গাপুর-এ ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন। সিঙ্গাপুর-এর পরবর্ত্তী ইতিহাস একটি উন্নতিশীল বন্দরের ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

সমগ্র সিঙ্গাপুর-এর উপর দিয়া প্রায় ২৫০ মাইল ব্যাপী সুন্দর-প্রশস্ত বড় বড় রাস্তা আছে। এ-জন্য বিদেশী পর্য্যটকেরা স্বচ্ছন্দে সিঙ্গাপুর-এর ভিতর দিয়া আনন্দে ভ্রমণ সমাপন করিতে পারেন। চলাফেরার সুবিধার জন্য আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর সুযোগ্য পরিচালক কর্ত্তৃক চালিত এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে নানারূপ যান বাহনের সুবন্দোবস্ত আছে এবং জাহাজ-ঘাটের সন্নিকট ষ্টীমারসমূহে উক্ত কোম্পানীকে স্বয়ংক্রিয় (Automatic) টেলিফোন্ করিবারও ব্যবস্থা আছে। মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে মোটরযোগে চীনাপল্লী ঘুরিয়া, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৌবহর (Navalbase), এরোপ্লেন ঘাঁটি ও আলকাফ কোম্পানীর রমনীয় উদ্যান দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। এতদ্ব্যতীত, সিঙ্গাপুর-এর সামুদ্রিক দৃশ্য, ইষ্ট কোষ্ট রোড ও গেলাং-এর সুন্দর নারিকেল বনের দৃশ্য অতীব উপভোগ্য।

সিঙ্গাপুর-এ দেখিবার, শিখিবার ও বুঝিবার জিনিস যথেষ্ট আছে। এখানকার যাদুঘর, সুপ্রীম কোর্ট, বোটানিক গার্ডেন, গবর্ণমেণ্ট হাউস, রবার বাগান, জোহোরের সুলতানের প্রাসাদ, জামে মস্‌জিদ, আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওশান বিল্ডিং প্রভৃতি দেখিবার জিনিস।
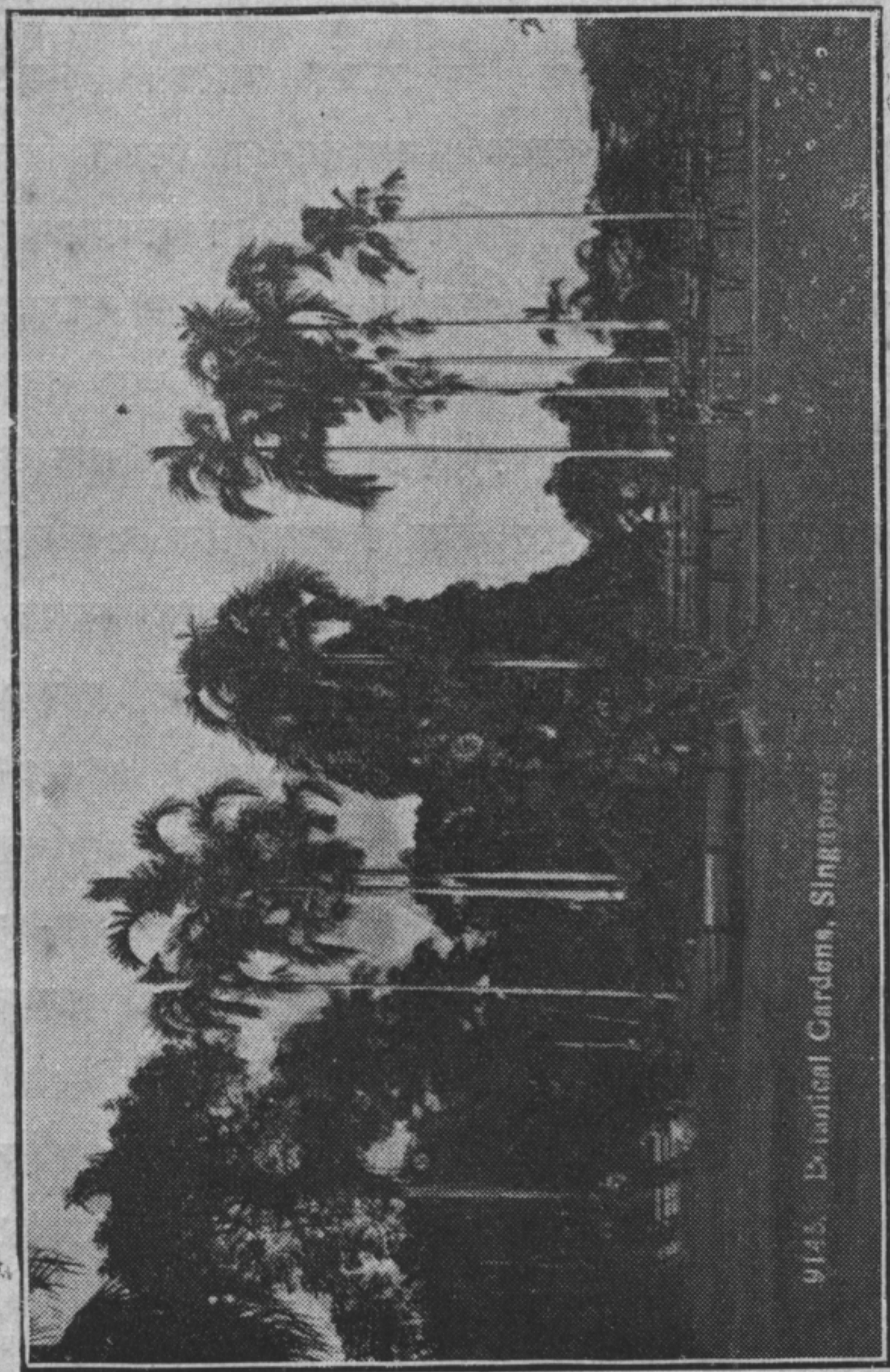
রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন

যাদুঘরে বহু দ্রব্য সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে, মালাক্কার বেত্র নির্ম্মিত তৈজসপত্র, ইপোহ'র প্রাচীন
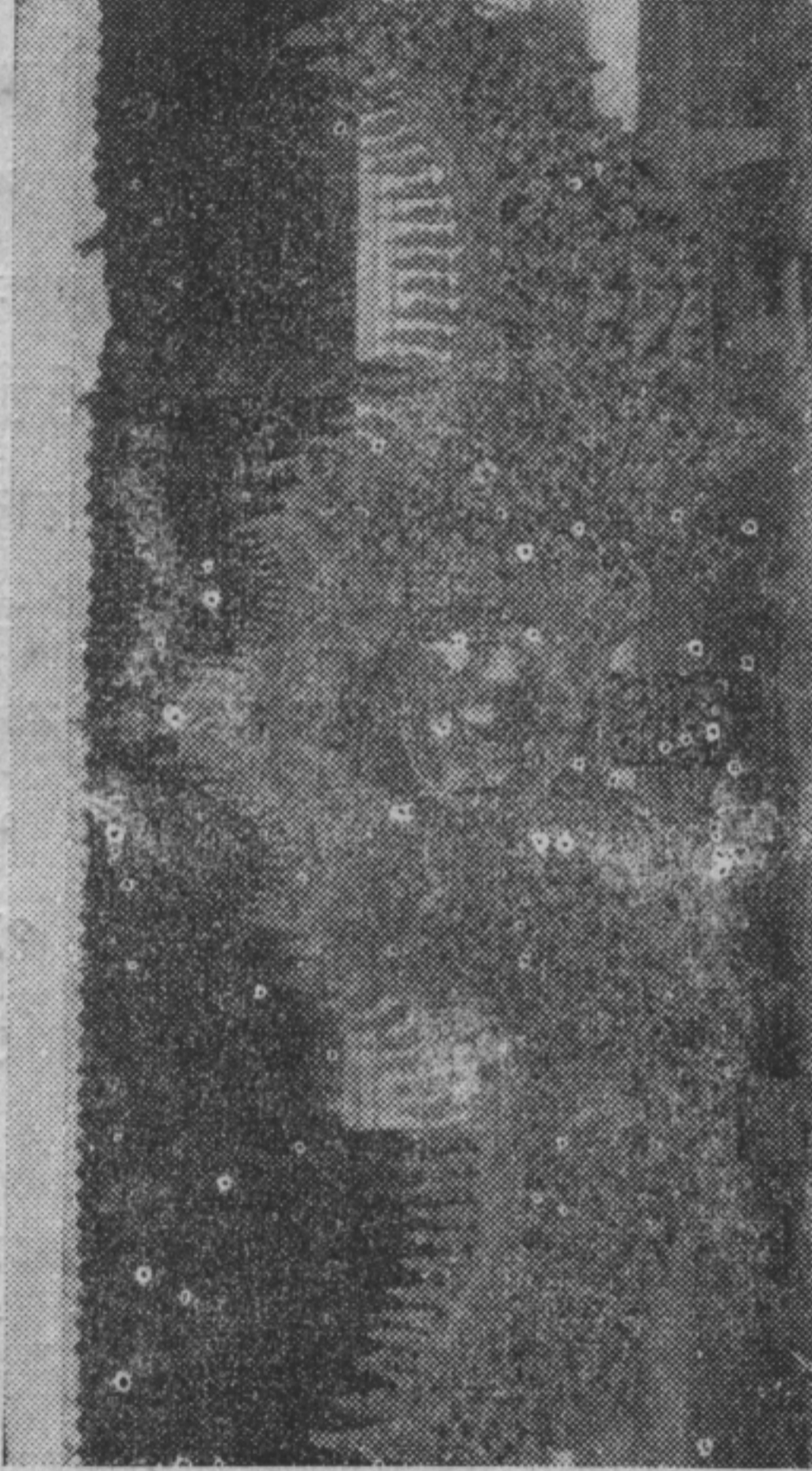
পেনাং দারুশিল্প

অধিবাসীদের আস্‌বাবপত্র, টেপিং-এর শিল্প, মালয়ের রাজধানী কুয়ালালমপুর-এর প্রাচীন মূর্ত্তি, শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক-এর প্রাচীন অধিবাসীদের পরিচ্ছদ, এনকর,

নোমপেন, সাইগণ, চোলোন, বরোবুডুর, উনোছুবুহ, গ্যারোট, ব্যাণ্ডোয়েং, ক্রুনি, বিটেনজোর্গ, টোছারী, সৌরাবাই, জোকাজারটা, বালি ইত্যাদি স্থানের প্রাচীন দারু-শিল্প, মৎস্য ধরিবার সরঞ্জাম, নৌকা,—মুলো, টাইমোর এবং হাওয়াই, হেইতি প্রভৃতি প্রশান্ত মহা-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বহু কৌতুহলোদ্দীপক দ্রব্যাদি (Curious) যাদুঘরে স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে।

সিঙ্গাপুর—ভারতীয়, চীনা, ম্যালেশিয়ান, ইয়োরেশিয়ান, জাভানীজ, সিংগেলিজ, বালিনিজ প্রভৃতি বহু শ্রেণীর নর-নারী পূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিচিত্র নগর। ইহা জগতের ১০টি শ্রেষ্ঠ বন্দরের মধ্যে একটি। শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি বন্য পশু বিচরণ করিত,—আর, আজ সেই স্থান অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত বিরাট শহরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এখান হইতে জোহোরের দূরত্ব মাত্র ১৭ মাইল এবং মোটরযোগে তথায় যাওয়া যায়। সিঙ্গাপুর হইতে সুদূর শ্যামরাজ্যে যাইতেও এখন আর বেগ পাইতে হয় না। রেলে চড়িয়া সনাতন বা অ-ছোঁয়া (Virgin forest) চির-নিবিড় অরণ্যের শোভা দর্শন করিতে করিতে নির্ব্বিঘ্নে তথায় পৌঁছা যায়। এমন একদিন ছিল, যেদিন এখান
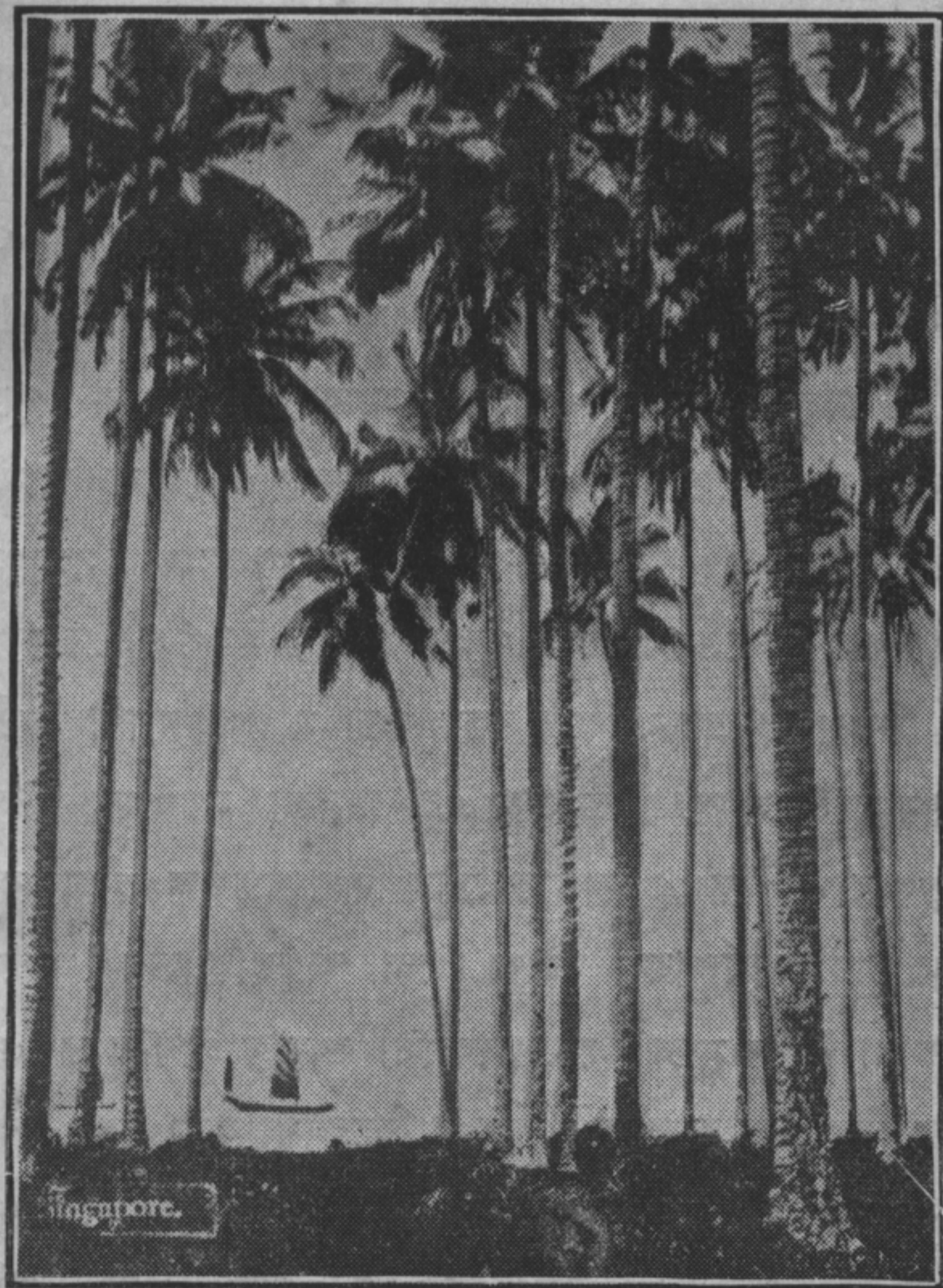
সিঙ্গাপুর নারিকেল বন

হইতে কোথাও যাওয়ার কথা দুঃস্বপ্নের বিষয়ীভূত ছিল।

সিঙ্গাপুর-এর রবার উদ্যান, আম্র ও আনারসের বাগান দেখার জিনিস। জগতের আবশ্যক রবার চাহিদার তিন চতুর্থাংশ এখান হইতে রফতানী হইয়া থাকে; এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখানকার আনারস বাক্সবন্দী (air tight) হইয়া চালান হইয়া থাকে। মাত্র ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে কয়েকটী রবার চারা এ দেশে আনীত ও রোপিত হয়। তাহার বংশবৃদ্ধি হইয়া আজ সিঙ্গাপুর-এর রবার জগতের চাহিদা পূরণ করিতে সমর্থ হইতেছে।

সিঙ্গাপুর-এর বাহিরে বহু শত মাইল ব্যাপী গভীর বনের মধ্যে সাপ, বন্য জন্তু এবং অসভ্য নরখাদক উলঙ্গ মানুষ বাস করে। তাহারা তীর দিয়া বন্যজন্তু হনন করে এবং তাহা সূর্য্যপক্ক, অথবা কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করে। তাহারা উলঙ্গ-নৃত্য করে, দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গান করে এবং বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আওতার বাহিরে থাকিয়া পশু-জীবন যাপন করে।

সিঙ্গাপুর-এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টির নাম—ষ্ট্রেট্স্ সেট্‌লমেণ্ট্স্। ইহা ব্রিটিশ ক্রাউন-কলোনী। ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত পেরাক, সেলাঙ্গার, পাহাং, পেডাং

ও নেগ্রিসেম্বিলান। কুয়ালালমপুর ইহাদের রাজধানী। সিঙ্গাপুর-এর গবর্ণর মালয় রাজ্যসমূহের হাই কমিশনার এবং উত্তর বোর্ণিও ও সারওয়াকের ব্রিটিশ এজেণ্ট। এতদ্ব্যতীত, কেলান্তান, কেদা, ইপোহ, সেরাম্বন প্রভৃতি কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য আছে। তন্মধ্যে, অনেকে স্বাধীন এবং কয়েকটি ব্রিটিশের আশ্রিত। প্রত্যেকের নিজস্ব ডাক-টিকিট ও মুদ্রা আছে। ইহাদের শাসনকর্ত্তা মুসলমান।

সিঙ্গাপুর-এ প্রায় ৫০।৬০টি জাহাজ-পরিচালক কোম্পানী, সামুদ্রিক তাড়িৎবার্ত্তা (Cable) এবং বেতার-বার্ত্তা ষ্টেশন বর্ত্তমান। এখানে দস্তা ও টিনের খনি আছে। চীনারা বহু বৎসর পূর্ব্বে ভীতিসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে অভিযান (Expedition) করিয়া এইসব খনি আবিষ্কার করিয়াছিল। এখন এই সকল খনি হইতে তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

সিঙ্গাপুর-এ নরযান বা রিক্‌শ' আছে! রেঙ্গুনে ইহাকে বলে—ল্যাঙ্কা, পেনাং-এ—জিন্‌রিক্‌শ', মালাক্ক ও সিঙ্গাপুর-এ বলে—বেচা। দশ বারো হাজার লোক এই বেচা লইয়া শহরে দৌড়াদৌড়ি করিয়া পয়সা রোজগার করিয়া থাকে। তন্মধ্যে চীনাদের সংখ্যাই অধিক।

জাপানী ও চীনাদের হোটেলগুলিতে ভারতীয় খাদ্য ও পাওয়া যায়। তাহা বাদে আনারস, ম্যাঙ্গোষ্টিন, আম, বাদাম প্রভৃতিও পাওয়া যায়। ভারতীয়দের সহিত আহার করিতে চীনাদের কোন অপত্তি না থাকিলেও ভারতীয়েরা সাধারণতঃ ইহাদের সঙ্গে একত্র আহার করে না। কারণ, ইহাদের খাদ্য হাজার প্রকারের, কোনটী লম্বা, কোনটী প্যাচানো, কোনটী গোল— এইরূপ অদ্ভুত ধরণের উপাদেয় খাদ্য ভারতীয়দের চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। বোর্ডারদের পরিচর্য্যা করিবার জন্য জাপানী ও চীনা সুন্দরী তরুণী পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। তাহারা বোর্ডারদের আহারাদি পরিবেশন করিয়া থাকে। এই সকল হোটেলে দুর্নীতির স্রোত স্বতঃই প্রবাহমান, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহারা সকলেই মালয় ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। সিঙ্গাপুর-এ চীনার সংখ্যা শতকরা ৬০ জন, ৩০ জন মালয়, বাকী অন্যান্য জাতি। তথাপি, সাধারণ ভাষা মালয়। মালয়রা সকলেই মুসলমান। ইহারা নারী-পুরুষে কাজ করে, পর্দা করে না ও দেশীয় ভাষায় নাম রাখে। অনেক সময় ইসলামের মূলনীতিগুলিও ইহারা মানে না।

একখানা খবরের কাগজ বাহির করিয়া থাকে। বহু মালয় নারী ভারতীয় বিবাহ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতেছে। কোনরূপ কুসংস্কারের ধার ইহারা ধারে না,—রাজনীতির গন্ধও ইহাদের মধ্যে সংক্রামিত হয় নাই।

প্রকৃতি মালয়দের প্রতি বড়ই অনুকূল—ইহারা এক-ঘণ্টা কাজ করিলে দুইদিনের আহার্য্য জোগাড় হইয়া যায়। সাধারণতঃ মৎস্য বিক্রয়, রবার চাষ, আনারস প্রভৃতি ইহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন।

সিঙ্গাপুরে-এ শিশু-মৃত্যু একরূপ নাই বলিলেও চলে। এদেশকে শিশুর ভূস্বর্গ বলিয়া অভিহিত করা হয়। মালয় ও চীনা মুসলমানগণ বহু বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী। সন্তান-সন্ততি হইলে সাধারণতঃ উপেক্ষার ভিতর দিয়া মানুষ হইয়া থাকে। এইসব কারণে ইহারা প্রায়শঃ ধর্ম্মভাববর্জ্জিত ও নিষ্ঠুর হয়। শহরে বহু মস্‌জিদ থাকা সত্ত্বেও এক শুক্রবার ব্যতীত ইহাদিগকে তথায় বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন অপরিচিত ব্যক্তি মালয়কে তাহার পরিচয়, অথবা, গন্তব্য স্থান জিজ্ঞাসা করিলে ভয়ানক রাগ করে; এমন কি, ছোরা মারিয়া বসে। কিন্তু, পরিচয় হইয়া গেলে অকপটে ও

সরলভাবে সকল কথা বন্ধুর কাছে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা সহজ কথা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়াই সহসা চটিয়া উঠে।

মালয়গণ চমৎকার শাল, রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারে; এবং সুচি-শিল্পে বিশেষ পটু। কাষ্টম ডিউটি এদেশে না থাকায় অল্প মূল্যে বৈদেশিক দ্রব্য পাওয়ায় দেশে তৈয়ারী এইসব নিপুণ-শিল্প ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। প্রতীচ্যের প্রচণ্ড প্রভাবে প্রাচ্য বেশভূষাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং হ্যাট-কোট সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সিঙ্গাপুর-এর লুঙ্গি এখনো ভুবন বিখ্যাত। ধুতি কাপড় কেহ পরে না।

সিঙ্গাপুর-এর কয়েকটী রাস্তা খুব বিখ্যাত। তাদের নাম যথাক্রমে—আর্চ্চার্ড রোড, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, ষ্ট্যামফোর্ড ষ্ট্রীট, হাই ষ্ট্রীট, মালাক্কা ষ্ট্রীট প্রভৃতি। বিশিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে মিঃ আলকাফ, মিঃ আলসাগোফ, মিঃ আলসাক্বাফ, মিঃ আঙ্গুলিয়া ডাঃ জুনেদ, ডাক্তার ইব্রাহিম, আর্টিষ্ট হামিদ, নামাজী, হাজী আম্বাস্তলো, শেখ আহমদ আফিফী, সৈয়দ আহ্মদ-বিন-মোহাম্মদ, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তি প্রবাসী আরব। ইঁহারা প্রত্যেকেই কোটিপতি। ব্যবসায় করিয়া ইঁহারা

বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন; শহরের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বাড়ীগুলি ইঁহাদের। মালয় দেশে ইহাদের প্রতিষ্ঠা অসামান্য। উদ্যান, শিক্ষা প্রভৃতি সকল সদনুষ্ঠানে ইঁহাদের দানই সর্ব্বোচ্চ। ইঁহারা প্রত্যেকেই মার্জ্জিত-রুচি-সম্পন্ন এবং অমায়িক ভদ্রলোক।

সিঙ্গাপুর-এ ভারতীয় মুদ্রা চলে না। এখানে ডলার, সেণ্ট, তালি প্রভৃতি রৌপ্য ও নিকেল মুদ্রা চলে। দেড় টাকায় এক ডলার হয়। নোট ভাঙ্গাইতে হইলে বাটা দিয়া পোদ্দারের নিকট হইতে ভাঙ্গাইয়া লইতে হয়। শহরের সর্ব্বত্র অসংখ্য ভেণ্ডার বসিয়া মুদ্রা-বিনিময় (Exchange) কার্য্যে রত থাকে। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় মুদ্রা ইঁহাদের নিকটে বিনিময় করা যায়। এই ব্যবসায়ে ইঁহাদের প্রভূত অর্থাগম হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট এ-জন্য কোন আপত্তি করেন না। তবে, এইজন্য লাইসেন্স লইতে হয়।

সিঙ্গাপুর বন্দরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ দেখা যায়। এতোবড় জাহাজ কলিকাতা, রেঙ্গুন প্রভৃতি বন্দরে গেলে ঘূর্ণায়মান চালক-চক্র বা প্রোপেলার (Propeller) মাটিতে ঠেকিয়া যায়। ঐ সমস্ত বন্দরে যে সব জাহাজ যায়, তাহাদের বড় জোর ৮,০০০ হাজার টন মাল বহন করিবার

ক্ষমতা থাকে; কিন্তু, সিঙ্গাপুর-এ ম্যাজেষ্টিক, নেল্‌সন, নরম্যাণ্ডি প্রভৃতি পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজও আসিয়া থাকে। এই সকল জাহাজ ৫২,০০০ হাজার হইতে ৭৯,০০০ হাজার টন পর্য্যন্ত মাল বহন করিবার ক্ষমতা রাখে।

সিঙ্গাপুর টাইমস্‌, সিঙ্গাপুর গেজেট নামক কতকগুলি দৈনিক ও সাপ্তাহিক ইংরাজী কাগজ এখান থেকে বাহির হয়। ভারতে কাগজ পাঠাইতে ৪ সেণ্ট লাগে। বিমান-ডাকে পত্র লিখিতে পাঁচ আনা, সাধারণভাবে তিন আনা এবং পোষ্টকার্ড লিখিতে ছয় পয়সা লাগে।

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতা সুমাত্রায় বিশেষ ভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে। মিডানের (Medan) সুন্দর হোটেল, সুদৃশ্য ব্যায়াম-ভবন, আদর্শ স্বাস্থ্য-নিবাস ও ব্রাসটাগিতে (Brastagi) বর্ত্তমান কালোপযোগী সর্ব্বপ্রকার সৌখিন-দ্রব্য দৃষ্ট হয়। ব্রাসটাগির কিছুদূরে বাটাক (Battak) জাতি বাস করে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তাহারা নর-মাংস ভক্ষণ করিত। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিয়া অধুনা তাহারা শান্তিপ্রিয় হইয়াছে ও সভ্যজীবন যাপন করিতেছে। তাহাদের অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া

সুমাত্রা

বিশিষ্ট নাগরিক জীবনও অতিবাহিত করিতেছে। বাটাক জাতি যদিও এখনো পর্য্যন্ত হিংসা-প্রবৃত্তি পরিহার করে নাই, তথাপি, তাহাদের অঙ্কিত শিল্প-কলা খুব প্রশংসনীয়। তাহাদের পল্লীপথে যে সমস্ত সমাধি-স্তম্ভ ও মিনার দেখা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য (সুমাত্রা)

যায়, ভাস্কর্য্য-শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া সগুলিকে মিসরীয় শিল্পের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুমাত্রার গভীর অরণ্যে এখনো যে-সব কারু-শিল্পের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, সেগুলি সুদূর, অথবা অদূর ভবিষ্যতে ইতিহাস-কারদের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রকৃতি যেন তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য সুমাত্রার আকাশে-বাতাসে, কাননে-পাহাড়ে, ও সমুদ্র-সৈকতে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে। এখানকার তোবা হ্রদ (Lake Toba) অফুরন্ত সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ইহা ৩০০০´ তিন হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত এবং দুর্ভেদ্য পাহাড়-শ্রেণী

সুমাত্রায় সূর্যাস্ত

পরিবেষ্টিত। এইসব পাহাড়ের অধিকাংশই অগ্নি-গিরি এবং ইহারা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০০´ সাত হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ। সুমাত্রার ম্যাপ দেখিলে এগুলির অবস্থান ভালোভাবে বোঝা যাইবে।

তোবা হ্রদের পরিধি ৮০০শত বর্গমাইল। সাধারণতঃ ইহাকে দ্বীপ-সমুদ্র (Island sea) বলা হয়। এই দ্বীপের উপর অবস্থিত প্রপাট (Prapat) স্থানটির
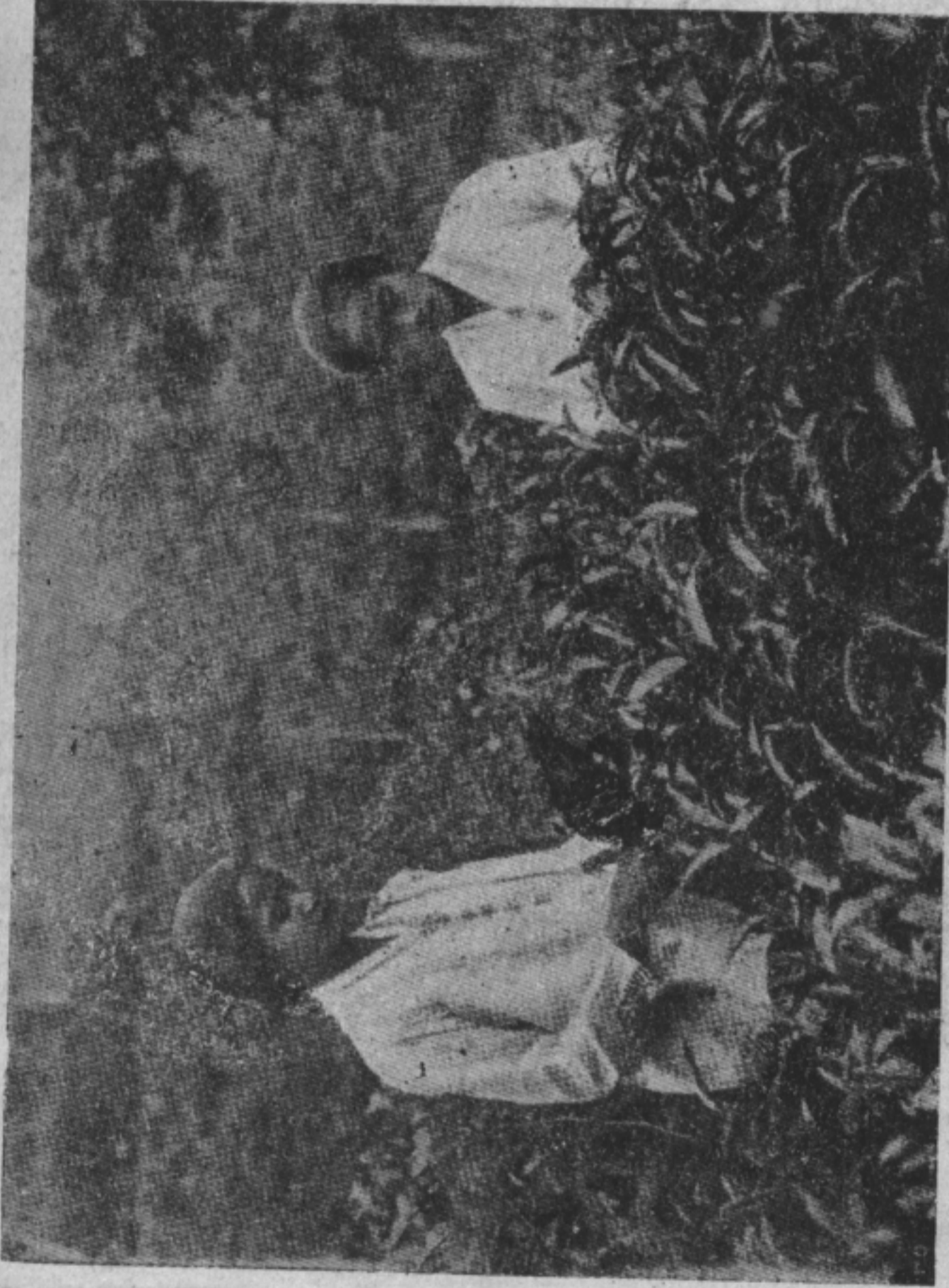
সুমাত্রার ফুলওয়ালী

প্রায় তিনদিক জল দ্বারা বেষ্টিত। এখানে খেলা-ধূলার বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। নৌকা-ভ্রমণ, সন্তরণ এবং

টেনিস্ খেলাও এখানে হইয়া থাকে। হ্রদের মাঝে ভ্রমণের জন্য মোটর-বোট ভাড়া পাওয়া যায়। ইহার সাহায্যে হ্রদের মধ্যবর্ত্তী শ্যামুশির দ্বীপে পৌছা যায়। এই হ্রদের জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং বরফের ন্যায় শীতল। বালু-বেলাভূমি ক্রমশঃ গভীর হ্রদের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে ; এই হ্রদের জলে স্নান অতীব আরামপ্রদ।

পেডাং হাইল্যাণ্ডের মিনাংকাবো (Minangkabu) জাতিদের কুটির নির্ম্মাণ-কৌশল বিচিত্র ধরণের। এইরূপ অদ্ভুত-দর্শন গৃহ পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কুটির-ছাদের উপর শিং-সদৃশ একপ্রকার দ্রব্য দেখা যায়। গৃহের চাল খড় দিয়া ছাওয়া এবং দেওয়াল বাঁশ, অথবা পাথর দিয়া তৈয়ারী। মিনাংকাবো নারীদের পরিধেয় বস্ত্রাদি সুমাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষীয় সুন্দরী-দের বস্ত্রাদির চেয়ে তাহা কোন অংশে হীন নহে।

ফোর্ট-ডি-কক্ (Fort-De-Kock) ও পাজা-কোম্বো নামক স্থানে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে। এখানে বিভিন্ন জাতীয় নানাধরণের পরিচ্ছদধারী সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া থাকে। সুমাত্রাবাসীদের আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা এবং রীতিনীতি জানিবার বেশ সুযোগ এখানে পাওয়া যায়।

সুমাত্রায় অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে। তন্মধ্যে, পোনো এবং ওয়েল্‌হেল্‌মিনা প্রপাত সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়-কর। পাহাড়ের শিখরদেশ হইতে প্রবলবেগে লক্ষ-কোটী গ্যালন জল একযোগে গড়াইয়া আসিয়া হাজার

তোরাদজা গৃহ

ফিট নিম্নে পড়িতেছে! সেই ভীষণ বেগে পতনের ফলে জলরাশি শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ও লক্ষ রামধনুর সপ্তরঙের খেলা খেলিয়া ভয়াবহ গর্জ্জনে আছাহান নদীর স্রোতের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিতেছে। কাহার সাধ্য, সেই প্রচণ্ড উন্মত্ত-তরঙ্গের সম্মুখে দাঁড়ায়! এই

অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য সত্যই বিস্ময়উৎপাদনকারী, চিরপ্রহেলিকাময়!! চিররহস্যময়ী প্রপাতগুলি অনন্তকাল হইতে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য লইয়া বহিয়া যাইতেছে। এ-প্রবাহের শেষ নাই, ইতি নাই—সৃষ্টির আদিকাল হইতে অনাদিকাল পর্য্যন্ত হয়তো ইহা এইভাবে প্রবাহমান থাকিবে। এই
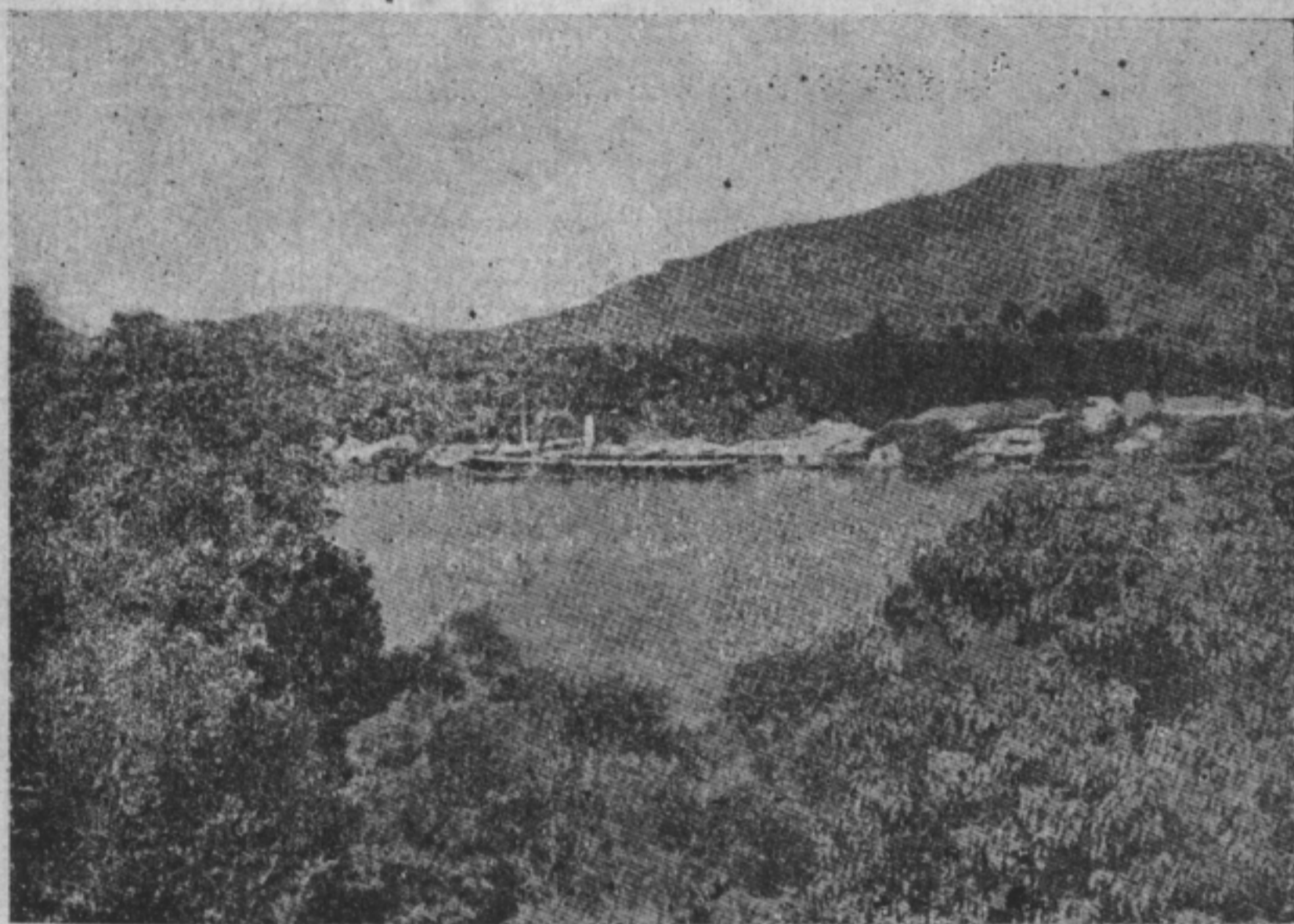
তোবা হ্রদ

প্রপাতের অজানা-রহস্য উদঘাটনের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার জারমান (Civil Engineer Yzerman) প্রভৃতি মনীষিগণ অন্যূন ৯০ বার বৈজ্ঞানিক অভিযান করিয়াছেন। মাসের পর মাস ধরিয়া সুমাত্রার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়াছেন, গভীর জঙ্গলের ভিতর মত্ত-

মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনো নরখাদক অসভ্য বনমানুষের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া নিজকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাকৃতিক প্রতিকূল আব-হাওয়া তাঁহার অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারে নাই। জারমানের কাণে অজানার আহ্বান আসিয়াছিল—তাই তিনি নিমেষের জন্যও স্থির থাকিতে পারেন নাই।

অম্বইনা উপসাগর

অধুনা, মোটর, অথবা রেলযোগে ভ্রমণকারীরা অবাধে পেডাং হাইল্যাণ্ডের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে মিনাংকাবো, বাটাক, তোবা হ্রদ, ব্রাসটাগির রমণীয় মালভূমি, সৃষ্টির

অতুল শোভায় ভরা গিরি-শ্রেণী এবং মনোরম গোলাপ-বাগ দেখিয়া আসিতে পারেন। আশ্‌ফ্যাল্ট্‌মণ্ডিত মসৃণ-রাস্তায় মোটরযোগে ভ্রমণ করিবার সময় তামাকের ক্ষেত্র, রবার বাগান, সরল বা তার্পিণ গাছ প্রভৃতি দেখা যায়।

সুমাত্রার গৃহ

মিডান (Medan) শহর বাণিজ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রস্থল। এই শহরের রাস্তা দিয়া অহর্নিশি হাজার হাজার নর-নারী আপন মনে গন্তব্যস্থানে যাওয়া-আসা করিতেছে। এখানকার সুন্দর উদ্যান,

সুদৃশ্য হোটেল এবং ভালো ভালো বাড়ী দর্শকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
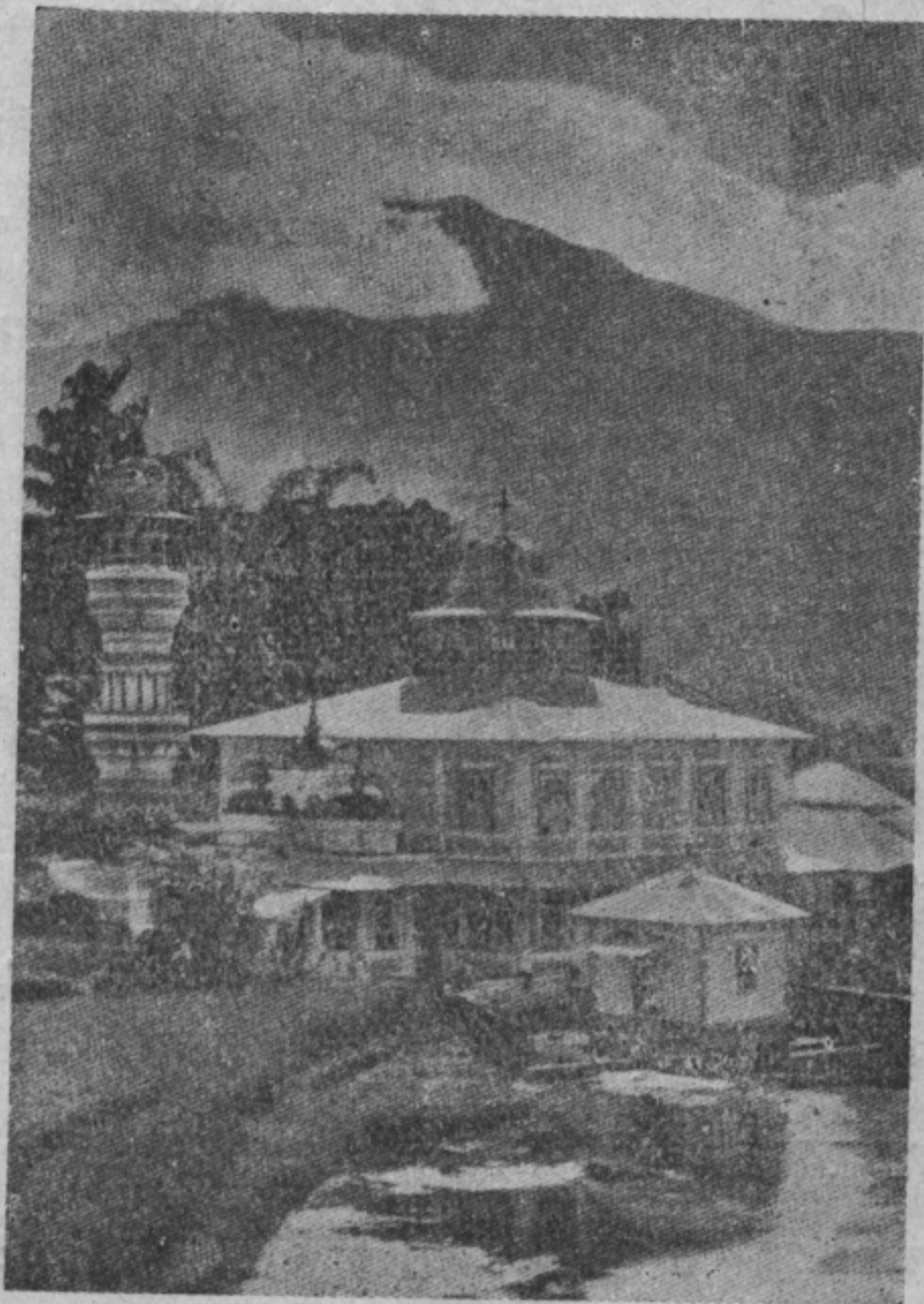
ফোর্ট-ডি-কক (সুমাত্রা)

মিডানের নিকটে বেলাওয়ান ডেলি (Blawan-Deli) নামক বন্দর অবস্থিত। এখান হইতে জাহাজ সোজাসুজি ইয়োরোপ, কলম্বো, পেনাং পোর্ট সোয়েটেন্‌হাম্‌, সিঙ্গাপুর এবং ব্যাটেভিয়ায় যাতায়াত করে।

এতদ্ব্যতীত, এখান হইতে পৃথিবীর যাবতীয় বন্দরের সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জাভার রাজধানী ব্যাটেভিয়া হইতে সরাসরি সুমাত্রার পেডাং-এ পৌঁছিবারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সাবাং হইতে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ডাচ্ মেল (Dutch Mail) গমনাগমন করে। সুমাত্রার প্রধান প্রধান নগরের নাম ; যথাক্রমে—বেন্‌কুলিন্, পেলাম্বাং, পেডাং, বেলাওয়ান, মিডান ইত্যাদি। ডাচ্ গবর্ণমেণ্টের শাসনে দেশবাসীরা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে।

সৌরারাই হইতে জাহাজে উঠিয়া বালিদ্বীপে যাইতে মাত্র বারো ঘণ্টা সময় লাগে। মোটরযোগে তিনদিনে এই দ্বীপ-ভ্রমণ শেষ করা যায়। একবার যিনি এই দ্বীপে আসিবেন, তিনি ভালোভাবে ইহার স্বভাব-শোভা উপভোগ না করিয়া ফিরিতে পারিবেন না। গগন-চুম্বী পাহাড়-শ্রেণী, আদিম যুগের বৃক্ষ, বিরাট-বিশাল পার্ব্বত্য নদী, ভীতিপ্রদ জলপ্রপাত প্রভৃতিতে ভরা আশ্চর্য্য এই দেশ! এখানে আসিলে মনে হয়, যেন সৃষ্টি-জগতের অপর প্রান্তে কোন্ এক অজানা অচেনা কল্পরাজ্যে বিচরণ করিতেছি। এমনই চমৎকার এবং মনোহর এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য!

বালিদ্বীপ

এই দ্বীপবাসীরা শান্তিময় সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করে। ইহাদের তাপদগ্ধ তনু কর্ম্মশীলতার

বালিদ্বীপের জল-প্রপাত

সাক্ষ্য দেয় এবং ইহাদের দ্বিধাহীন স্বাধীন চলা-ফেরা পর্য্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এখানকার মেয়েরা সাধারণতঃ কোমর পর্য্যন্ত কাপড়

পরে। ইহাই ইহাদের সামাজিক প্রথা। কৃত্রিম উপায়ে প্রসাধন বা রূপ-চর্চ্চার পরিকল্পনা ইহাদের মধ্যে সংক্রামিত হয় নাই। ইহারা নারী-পুরুষে সারি বাঁধিয়া নাচিতে গাহিতে লজ্জাবোধ করে না। প্রকৃতির সাথে গা ঢালিয়া দিয়া উদার-উন্মুক্ত আকাশতলে বে-পরোয়াভাবে বাস করায় সঙ্কোচ-সঙ্কীর্ণতা ইহাদের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছে। কিশোরী-তরুণী, যুবতী-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা-স্থবিরা —সকলেই একত্রে ও একসঙ্গে অনাবৃত বক্ষে দেবালয়ে উপস্থিত হয় এবং ভক্তিভরে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অরুণ ও লক্ষ্মীর চরণে সমর্পণ করে। কোন পুরুষ তাহাদের দিকে লালসা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না—নারীর প্রতি সম্মান দর্শাইয়া মস্তক অবনত করিয়া পাশ কাটাইয়া চলে। অজ্ঞাতসারে যদি বা কেহ চায়, সে চাওয়া শ্লীলতাবর্জ্জিত নহে।

দেশের জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর। এই পার্ব্বত্য দেশে সারা বৎসর মন-প্রাণ বিমুগ্ধকারী ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বহিয়া থাকে। এই সুশীতল মৃদু-মন্দ ফুর্‌ফুরে সমীরণে নর-নারীর অন্তরে অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি-উল্লাসের পীযূষ-ধারা প্রবাহিত হয়। এই পাহাড়ময় দেশের পাহাড় যাহাকে একবার ডাকিয়া অমিয়-ধারার সন্ধান-দানে সঞ্জীবিত করিয়াছে, সে সমতল ভূমিতে কখনো একযোগে বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারিবে

না। পাহাড়ের মায়াবী-মায়াজাল পর্য্যটকের মনের উপর প্রভাব-বিস্তার করিয়া চিরদিনের মতো তাহাকে

বালির মন্দির

আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিবে। পাহাড়ের এই প্রচ্ছন্ন বশীকরণ-শক্তি এমনি রহস্যপূর্ণ ও সর্ব্বনাশা।

এই দেশীয় অধিবাসীরা হিংসাপরায়ণ না হইলেও দেশের অভ্যন্তরভাগ এখনো মৃত্যু-গহন ও ভীতি-সঙ্কুল। এ-পথে বহু গর্ব্বদীপ্ত শক্তিধর পুরুষ অসম সাহসে আসুরিক অভিযান করিতে যাইয়া মরণের সাথে কোলা-

বালিদ্বীপবাসীদের রবার প্রস্তুত কার্য্য

কুলি করিয়াছেন। কতজন আদিম যুগের বন্ধুর অক্ষত-বনে পথ হারাইয়া গভীর অরণ্য-মাঝে হিংস্র পশু-মানুষের মুখে নিজকে বিলাইয়া দিয়াছেন। হয়তো তাহার বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—করুণ আর্ত্তনাদ অসভ্য উলঙ্গ নরখাদকেরা গ্রাহ্য করে নাই। আনন্দোন্মত্ত নৃত্য

ও অট্টহাসির সঙ্গে পথভ্রান্ত অভিযানকারীর মাংস টানিয়া-ছিঁড়িয়া খাইয়াছে,—দুর্ব্বোধ্য জঙ্গলে-পাহাড়ে ভাষায় তাহার সকল আবেদন নিবেদন উপেক্ষা করিয়া মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছে।

এই রমণীয় দ্বীপের সভ্যতা ইহার নিজের সৃষ্টি। বিরাট মন্দির, বিশাল স্নানাগার, উন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভ দেশের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যেক মন্দিরগাত্র কারুকার্য্য-মণ্ডিত—তাহা দূর-অতীতের দারু-শিল্প ও স্থপতি-বিদ্যার চরম নিদর্শন। এই দ্বীপের পরিধি ১০৫·৫ বর্গমাইল এবং লোক-সংখ্যা প্রায় দশলক্ষ। সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত শহরের সুরম্য দেবমন্দির ও বিগ্রহ সকলের কৌতূহলদৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার ভাস্কর্য্য-শিল্প খুব উন্নত ধরণের এবং সাজ-সরঞ্জামে ইহা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী। আমাদের দেশের যে-কোন ঐশ্বর্য্যশালী মন্দিরের সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। পল্লী-মন্দির, গৃহ-মন্দির এবং সেতু-মন্দির সমগ্র দ্বীপ-ভূমির শোভা-সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে।

সৌরাবাই বন্দর পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে কে-পি-এম এজেন্সির নিকট হইতে যাবতীয় দরকারী তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস জাহাজই বিশেষ

সুবিধাজনক। বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় জাহাজ সৌরাবাই জেটি পরিত্যাগ করিয়া পরদিন প্রত্যূষে বিলেলঙ্ পৌঁছে।

বিলেলঙ্ হইতে সিঙ্গারদ্জা, দেন্পাসার, টম্পক সিরিঙ্গ, ক্লুয়েঙ্কিয়ং, কিণ্টামণি, মণ্ডুক, বোবোনান প্রভৃতি স্থানে যাইবার প্রশস্ত পাহাড়িয়া রাস্তা আছে। ক্লুয়েঙ্কিয়ং হইতে রিভিরা-কর্ণিক রোড ধরিয়া বেলাভূমির উপর দিয়া কারেঙ্গ-আসেম এবং তথা হইতে বাতোর দর্শন করিয়া সিঙ্গারদ্জা ফিরিতে হয়। এইরূপে অল্প সময়ের ব্যবধানে বালিদ্বীপ পর্য্যটন সমাপন করা যায়।

বাতোরের আগ্নেয়গিরির দৃশ্য নয়নাভিরাম। ইহার সম্মুখে বাতোরের চিত্তবিমোহিনী হ্রদে তরতর্ করিয়া লহরমালা নাচিতেছে-দুলিতেছে—সে দৃশ্য অতি মনোজ্ঞ এবং উপভোগ্য। এই হ্রদের পশ্চাদ্ভাগে বালি-পাহাড়ের উচ্চ চূড়া। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার শীর্ষদেশের উচ্চতা ৩২০০ মিটার। শৃঙ্গের চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল। তাহার মধ্যে ভল্লুক, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ার বাস করে। উন্নত পাহাড়-শ্রেণী ও দুর্গম বনরাজির সহিত সম্বন্ধ যেখানে ঘনিষ্ঠ, মানুষের বসতি সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। ভয়সঙ্কুল জায়গা কোনক্রমে অতিক্রম করিলেই দর্শকের

চোখের সম্মুখে গ্রামগুলি, ছবির মতো মূর্ত্ত হইয়া উঠে গ্রামগুলি, ফাঁকে ফাঁকে মন্দির, পোয়েরা এবং চারি-পাশে লতাবিতানে ঢাকা হরিৎক্ষেত্র। কোন ক্ষেত্রে ইক্ষু, চা, কফি, তামাক, সিন্‌কোনা—আবার কোন বাগানে কচুজাতীয় তরকারী, বড় বড় ফার্ণ, কলাগাছ, ম্যাঙ্গোষ্টিন, গোলাপ, গাঁদা, জবা ইত্যাদি বিবিধ ফল-ফুলের গাছ। সে-দৃশ্য বাস্তবিক মনোহর। ম্যাঙ্গোষ্টিন ফলগুলি দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের গাবের মতো। ইহার স্বাদ মিষ্ট-কষায়-যুক্ত। এই সমস্ত বাগানের মালিক সাধারণতঃ ওলন্দাজরা। বালিদ্বীপবাসীরা ব্যবসায়ের দিক দিয়া ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পারে না।

পূর্ব্বোক্ত ক্লুয়েঙকিয়ং স্থানটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি ইহার সহিত বিজড়িত। এখানকার বাসিন্দারা খুব কর্ত্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান এবং ব্যবসায়ী। অনেকে কর্ম্মকার; তাহারা লৌহদ্বারা নানাবিধ সৌখিন অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। বন্যজন্তু হনন করিবার জন্য ইহারা রকমারী যন্ত্র ও অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিয়াছে।

এই অঞ্চলে একটি আধুনিক কায়দায় বা হালফ্যাসানে

নির্ম্মিত হোটেল হইয়াছে। বিদেশী আগন্তুক ভদ্রলোক এখানে আসিয়া আহার-বাসস্থান পাইতে পারেন। এজন্য নির্দ্ধারিত মূল্য দিতে হয়। এই সীমানার মধ্যে কয়েকটি

বালির কাষ্ঠ-শিল্প

সূক্ষ্ম খোদাই-কার্য্যসমন্বিত মন্দির আছে। তন্মধ্যে, কেশিমান, শিকাওয়াটি, দারু-শিল্প ও চিত্র-কলার দিক

দিয়া উল্লেখযোগ্য। টম্পকসিরিঙ্গে একটি পাষাণনির্ম্মিত স্মৃতি-মন্দির আছে। ডেন্‌পাসারে একটি চমৎকার যাদু-ঘর আছে। এই যাদুঘরে বালির বহু দ্রষ্টব্য বস্তু বিদ্যমান। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুর হাড়, মানুষের মাথার খুলি, পাথরের অস্ত্র, মৎস্য ধরার সরঞ্জাম, সামুদ্রিক মৎস্যের চোঁয়াল প্রভৃতি বহু দ্রব্য সাজানো রহিয়াছে।

গিয়ান্‌জার ও ওবিদ্‌ নামক স্থানে সময় সময় কুমারী তরুণীদের অভূতপূর্ব্ব নৃত্য-গীত, নানাবিধ অঙ্গ-সঞ্চালন দেখিবার সুযোগ ঘটে। মেয়েরা মূল্যবান পরিচ্ছদ ও দেশীয় বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নৃত্য-সভায় যোগদান করে। পরিশ্রান্ত দর্শকবৃন্দ উৎসব-সভায় বসিলে শ্রান্তি-জনিত অবসাদের অবসান হইবে।

বালিদ্বীপীয়রা মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করিয়া থাকে। ভূত-যোনী, দৈত্য-দানব, প্রেত-পোড়ো ইত্যাদির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কুসংস্কার ইহাদের মধ্যে খুব প্রবল। ভূতের ভয়ে ইহারা খুব শঙ্কিত-সন্ত্রস্ত। এমন কি, বিনা কারণে শ্মশানে ইহারা যায় না। মনে করে, এই অপদেবতার আড্ডা শ্মশানে। ভূতেরা যাহাতে দেশবাসীর কোন ক্ষতি করিতে না পারে, তজ্জন্য সময় সময় ওঝা ডাকিয়া মন্ত্র পড়ে এবং দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেয়। এইরূপে

ইহারা নির্ভয় হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। টম্পাকসিরিঙ্গ নামক স্থানে একটি রাজকীয় গোরস্থান দেখা যায়।
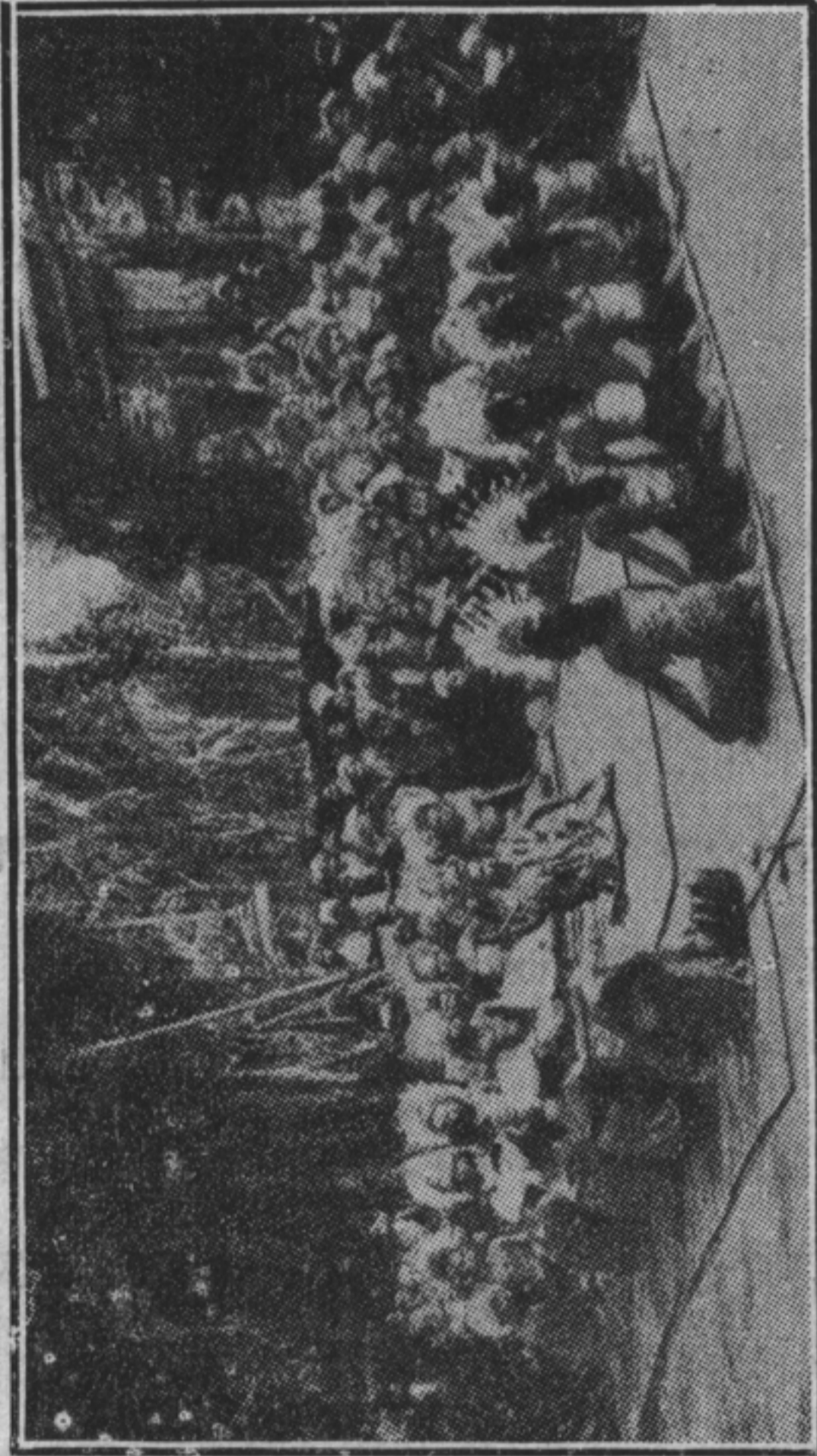
নৃত্যরতা বালিদ্বীপের কুমারী নর্ত্তকীগণ

সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষদিগকে অতীত দিনে এখানে সমাহিত করা হইত। ইহার আশেপাশে বিস্তর ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

গ্রামের ভিতর দিয়া চলার সময় বাঁশের খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ বহু লড়াইয়ের মোরগ দেখা যায়। ইয়োরোপের পল্লীগ্রামে যেমন ষাঁড়ের যুদ্ধ হয়, কৃষকগণ তাহাতে
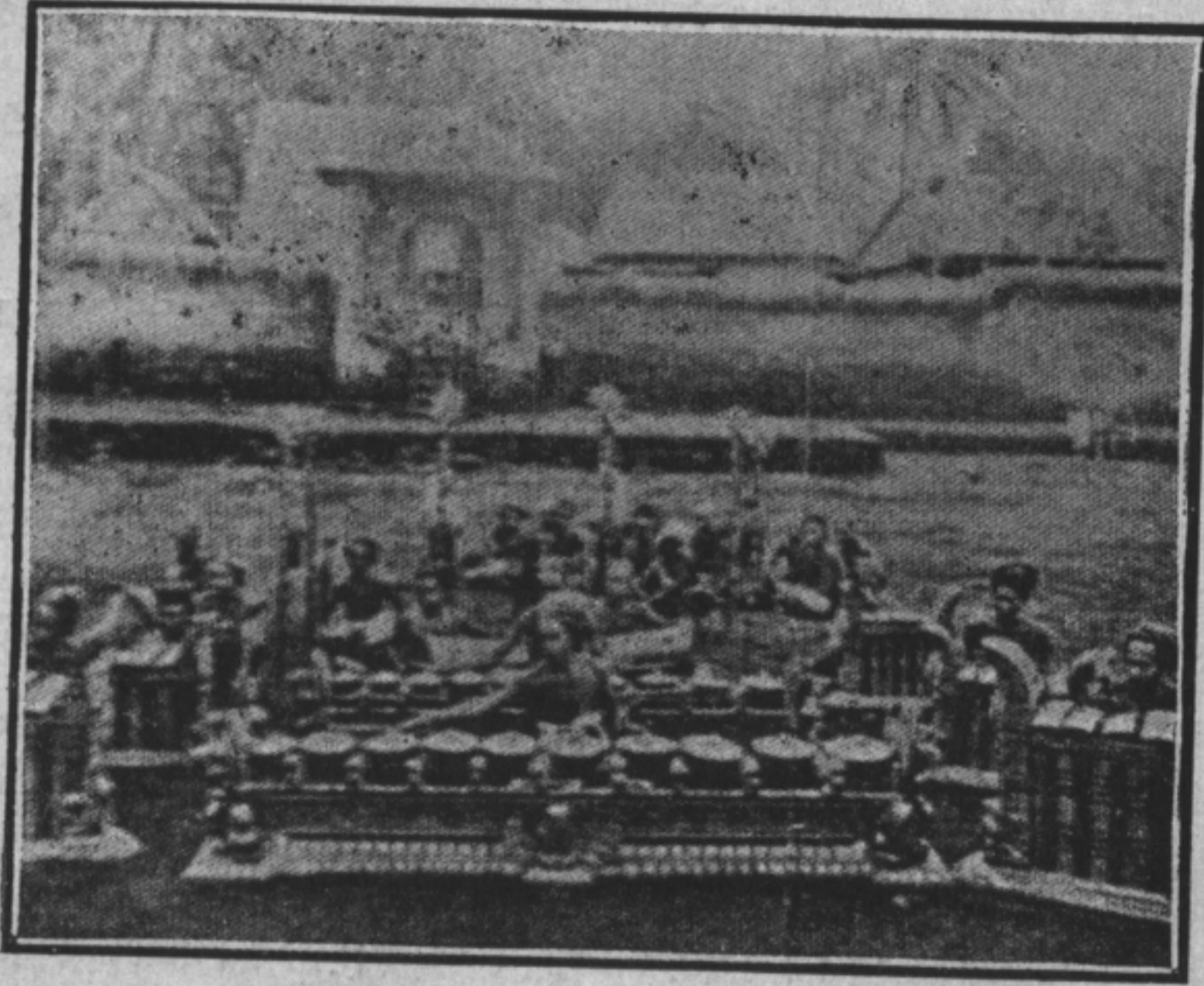
বালির বাদ্যবাদক দল

আনন্দ অনুভব করে—তেমনি বালিনিজরা মোরগের যুদ্ধ দেখিয়া অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। খোলা ময়দানে বাজী ধরিয়া দুই পক্ষ হইতে লড়াইয়ের মোরগ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চারিদিকে হাজার হাজার দর্শক একাগ্রচিত্তে তাহা দেখিতে থাকে। মোরগের পায়ে শানিত অস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়—তাহারা 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া উৎকট

কণ্ঠধ্বনিতে পার্ব্বত্য-গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যে পরাজিত হয়, অথবা, রণভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, তাহার মালিককে—বিজিত-মোরগ-স্বামীকে বাজীর নির্দ্ধারিত অর্থ দিতে হয়। এই তুচ্ছ লড়াইয়ের বিচার লইয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়া রক্তারক্তি কাণ্ড হয়। ফলে, যুগের পর যুগ দলাদলি ও বিবাদের ভিতর দিয়া ইহাদের দিন অতিবাহিত হয়। তবে, সাধারণতঃ ইহারা সদালাপী, প্রফুল্ল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন। চরিত্র-হীন নারী-পুরুষের সংখ্যা খুব কম। সকলে অদ্ভুত-দর্শন শিরস্ত্রাণ পরিধান করে—নিজেরাই তাহা প্রস্তুত করিয়া লয়। মেয়েরা পর্দ্দা করে না, পাহাড়ের ঝর্ণা-ধারায় ইহারা স্নান করিতে যায় এবং স্নান সমাপনান্তে পানীয় জল লইয়া বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করে। পুরুষদের কুকুর পোষার সখ্ আছে—সেগুলিকে বেশ শিক্ষা দেওয়া হয়।

বালিদ্বীপে হাজার বছরের প্রাচীন বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা দেখিলে আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ার বনভূমির কথা মনে পড়ে। শহরের উন্নতির জন্য অধুনা এগুলিকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করা হইতেছে।

সম্প্রতি মণ্ডুকের নিকটবর্ত্তী পাসাংগ্রাহানে টেলিফোন্ লাইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই, শহরের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তের সংবাদ গ্রহণ বা প্রেরণ করিতে এখন আর বেশী বেগ পাইতে হয় না। এখান হইতে বুলেলেঙ্

বালির কিশোরী নৃত্য

যাওয়ার পথে শ্যামল বনানী, নারিকেল বাগান, পার্ব্বত্য-সৌন্দর্য্য ও জনপদের ছবি মানসপটে ভাসিয়া উঠে। একদিকে ধূসর-ধূমময় পাহাড়ের শোভা—অন্যদিকে, অনন্ত নীল-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ। দেখিলে মনে হয়,

যেন স্বপ্নের ঘোরে বাস্তব জগত ছাড়িয়া কল্পলোকে আসিয়া উপনীত হইয়াছি।

বালিদ্বীপের নাকফোঁড়া রাঙা গরু পালে পালে এখান থেকে দেশ-বিদেশে চালান হয়। সমুদ্রকূল হইতে ক্রেণের সাহায্যে গরুগুলি জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হয়। এ-দেশে বিস্তর চারণভূমি থাকায় গরুর পর্য্যাপ্ত খাদ্যের অভাব হয় না। কাজেই, ইহারা যেমন বলিষ্ঠ হয়, তেমনি যথেষ্ঠ পরিমাণে দুগ্ধ দেয়।

*   *   *   *

পেরাক, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেম্বিলান এবং পাহাং, এই চারিটী দেশীয় রাজ্য লইয়া ফেডারেটেড্ মালয় ষ্টেট গঠিত। একজন ব্রিটিশ হাই কমিশনারের সাহায্যে মুস্‌লিম স্থলতানগণ ইহাদের শাসনকার্য্য চালাইয়া থাকেন। এই রাজ্যসমূহের জঙ্গলে বুনোমহিষ, বাঘ, সিংহ গণ্ডার প্রভৃতি বিচরণ করে। আয়তন—২৭৫০৬ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ১৫ লক্ষ।

কেদা, পারলিস্, কেলান্তান ও ট্রেঙ্গানু, এই চারিটী মুস্‌লিম স্থলতান শাসিত দেশীয় রাজ্য লইয়া নন্-ফেডারেটেড্ মালয় ষ্টেট গঠিত। একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট শাসনকার্য্যে স্থলতানকে সাহায্য করেন।

মুস্‌লিম সুলতান শাসিত দেশীয় রাজ্য। লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ, পরিমাণ ফল—৭৮৭৫ বর্গমাইল। রাজধানী—

পেরাক

টেপিং। লোকসংখ্যা—২৫,০০০ হাজার। চারি কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হয়। কুয়ালাকাংসার, পেরাকের পূর্ব্বতন রাজধানী। সুলতান রাজা স্যর ইদ্রিস মুর্শিদ-আল্‌-আজম শাহ্‌ ইবনে আল্‌ ইস্কান্দার শাহ্‌, জি-সি-এম-জি, জি-সি-ভি বাহাদুরের সময় ইহা পেরাকের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র রাজা মুদা আবদুল্লা একজন ব্রিটিশ হাই কমিশনারের সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালন করেন। ইপোহ এই রাজ্যের আর একটী প্রসিদ্ধ বন্দর।

এই দেশীয় রাজ্য ও মুস্‌লিম সুলতান শাসিত। লোক সংখ্যা—৪ লক্ষ। আয়তন—৩২০০ শত বর্গমাইল।

সেলাঙ্গর

রাজধানী কুয়ালালমপুর। লোকসংখ্যা—৮০,০০০ হাজার। একজন ব্রিটিশ রাজ-পুরুষ শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সুলতানকে সাহায্য করেন। সমগ্র ম্যালেশিয়ার মধ্যে ইহা একটী নয়নাভিরাম শহর। সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, উদ্ভিদ-উদ্যান প্রভৃতি দেখার জিনিস।

এই রাজ্যের লোকসংখ্যা—১২ লক্ষ। আয়তন—

১৪,০০০ হাজার বর্গমাইল। ফেডারেটেড্ মালয় ষ্টেটের মধ্যে, পূর্ব্বাংশে বিরাজিত এই রাজ্যটী সর্ব্ববৃহৎ। রাজধানী কুয়ালা-লিপিস্।

পাহাং

সুলতানের রাজপ্রাসাদ-পেকান নগরে অবস্থিত। ইহাই রাজ্যের পুরাতন রাজধানী। ইহার পার্শ্ববিধৌত করিয়া পাহাং নদী চীন-সাগরে মিলিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আরাম নিকেতন শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য। ধান, রবার ও বাহাদুরী কাঠ উৎপন্ন হয়। খনিজ টিন বিদেশ রফতানী করা হয়। সোনার খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুয়াস্তান এই রাজ্যের আর একটী উল্লেখযোগ্য শহর। ইহা রবার ও খনিজ দ্রব্যের কেন্দ্রস্থল। চীন-সাগর ও কুয়াস্তান নদীর মুখে অবস্থিত। সিঙ্গাপুর হইতে জাহাজে, অথবা কুয়ালাকুবু হইতে গভীর অরণ্য-পথ দিয়া গ্যাপ ও জিরান্তুত পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। সরকারী বিশ্রাম ঘরে পর্য্যটকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কুয়ালাকুবু হইতে রেলপথে গ্যাপ, বুকিত ফ্রেজার, ইপোহ,পেনাং, পোর্ট সোয়েটেন্হাম, পোর্ট ডিকস্‌ন, মালাক্কা, সেরেম্বান ও সিঙ্গাপুর যাওয়া যায়। পার্ব্বত্য রেলপথে পাহাড়ের উপর উঠা যায়। ফ্রেজারহিলের উচ্চতা—৪,২০০´ ফিট। পর্ব্বত হইতে সুরম্য রাস্তা জঙ্গলের ভিতর দিয়া শহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত

হইয়াছে। এই নিবিড় জঙ্গলে হস্তী, গণ্ডার, গাউর,
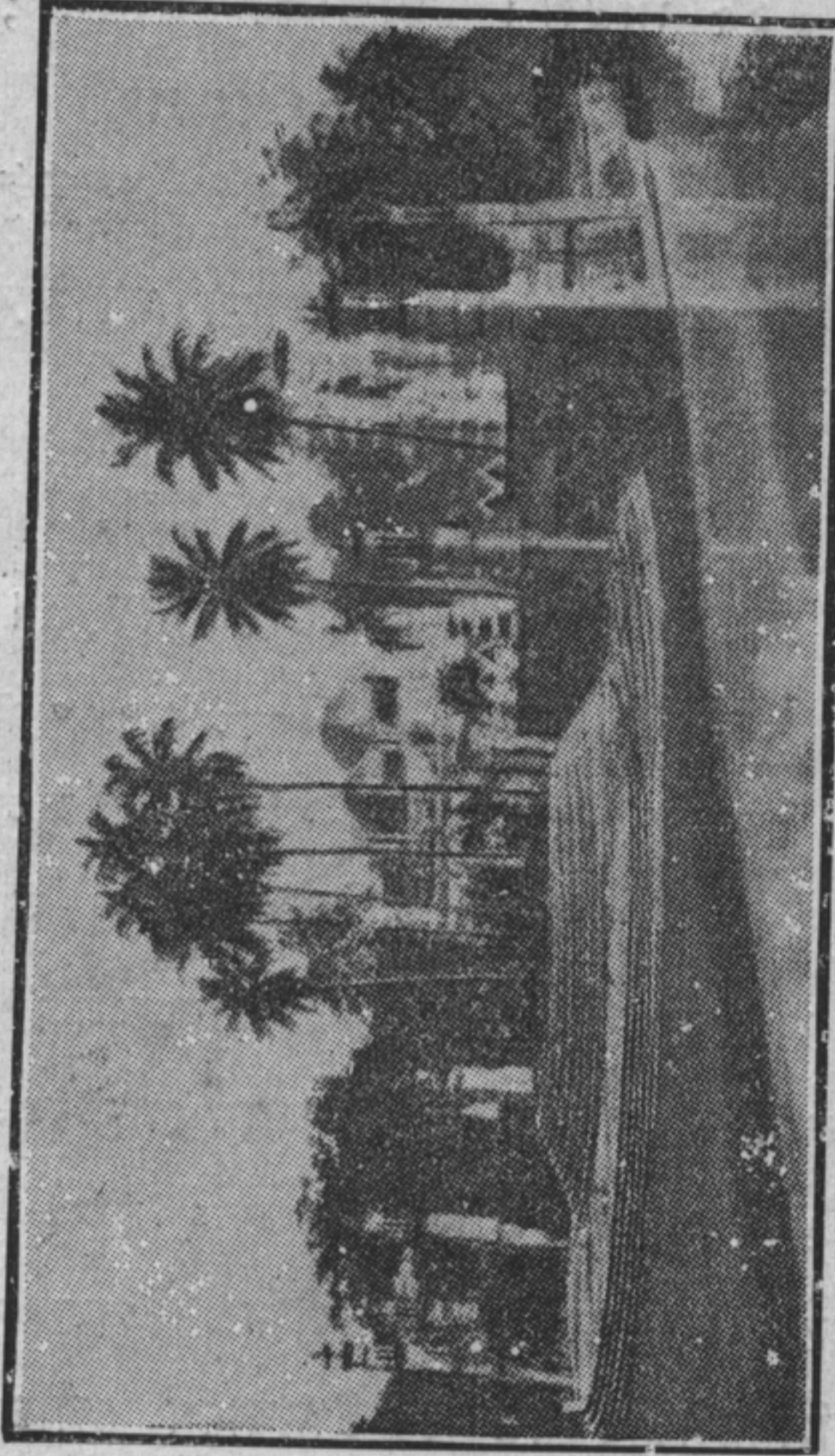
কুয়ালালমপুর মস্জিদ

পান্থার, পিগ্, সেলাডাং, টেপির, বাঘ, ভালুক এবং চিতাবাঘ বিচরণ করে।

এই রাজ্য, উপদ্বীপের পশ্চিমদিকে এবং মালাক্কার উত্তরে অবস্থিত। এখান হইতে রেলপথে সেরেম্বনের দূরত্ব ২৫ মাইল। স্বাস্থ্যকর জায়গা; সমুদ্র অবগাহন খুব আরামপ্রদ। পোর্ট ডিক্‌সন্ অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। ভ্রমণকারী, ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের অনুমতি লইয়া স্বাস্থ্য-নিবাসে মহানন্দে বাস করিতে পারেন।

নেগ্রি সেমবিলান

নন্-ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটের মধ্যে জোহোর রাজ্যটী সমৃদ্ধিশালী। ষ্টেটের রাজধানী জোহোর বাহ্‌রু। রাজধানীর লোক-সংখ্যা—১৬,০০০ হাজার; সমগ্র ষ্টেটের লোক-সংখ্যা—৩ লক্ষ। পরিমাণ ফল—৭,৬৭৮ বর্গমাইল। অধিবাসী-সংখ্যা অধিকাংশ মুসলমান। শাসনকর্ত্তা মুসলিম সুলতান। তাঁহার প্রাসাদ রাজধানীতে বর্ত্তমান। রাজ্যের মোট অধিবাসীর মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মালয়, একলক্ষ চীনা ও ত্রিশ হাজার ভারতীয়। তেব্রাউ প্রণালীর উপর রাজধানী অবস্থিত। সিঙ্গাপুর হইতে মোটরযোগে পৌঁছা যায়; দূরত্ব ১৭ মাইল। জোহোর বাহ্‌রু হইতে সিঙ্গাপুর শহরের জল সরবরাহ হয়।

জোহোর

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ
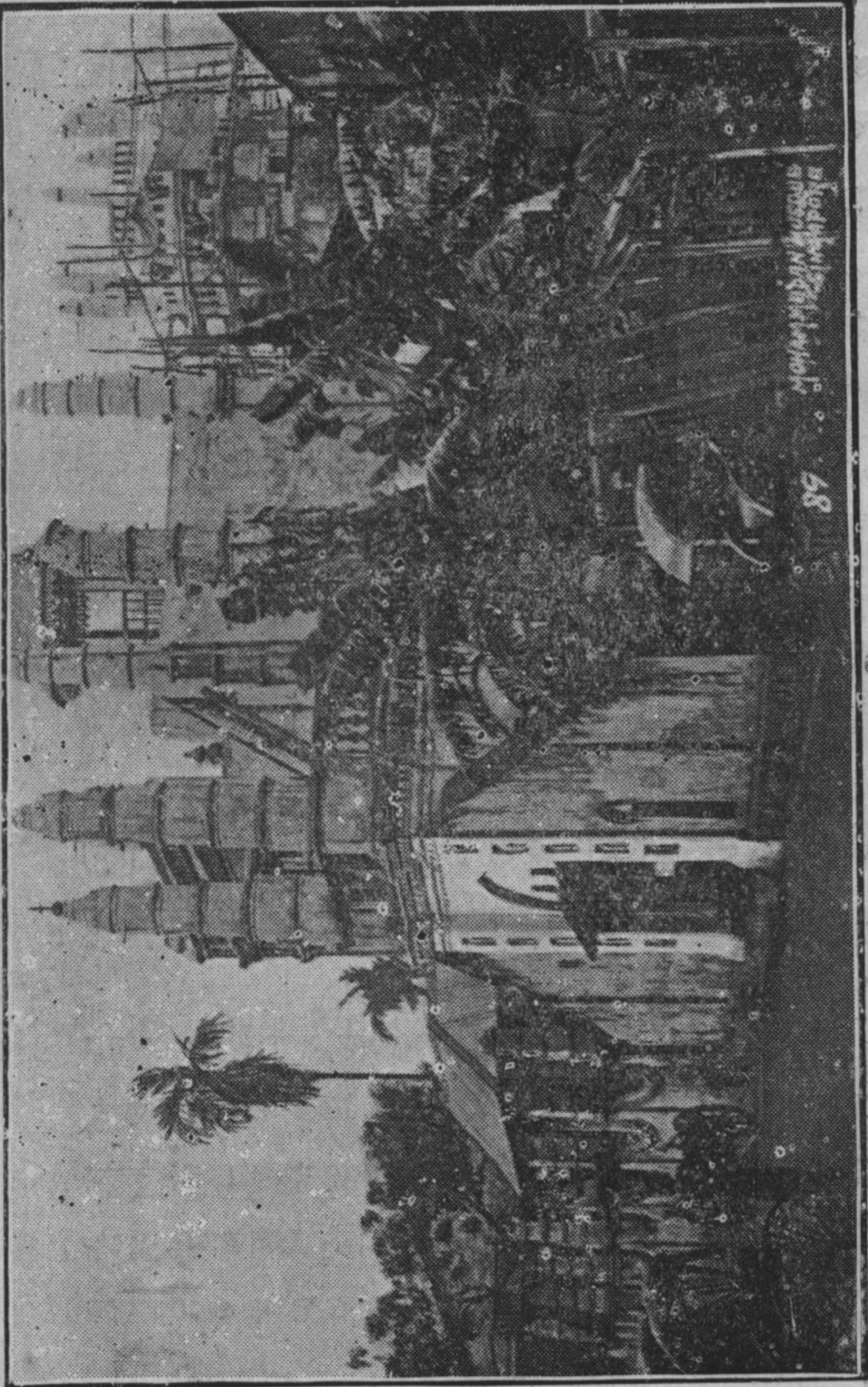
জোহোর মস্‌জিদ

রাজদূত অবস্থান করিতেছেন। মসজিদ, সরকারী অফিস, কেল্লা, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য। রবার, সীসা ও লোহা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ উৎপন্ন দ্রব্য।

এই রাজ্যের রাজধানী আলোরষ্টার। রাজধানীর লোক-সংখ্যা—১২,০০০ হাজার। পেনাং হইতে শ্যাম রাজ্যের সীমান্ত পেডাংবেসার পর্য্যন্ত বিস্তৃত লাইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ধান্য কেন্দ্র। সমগ্র রাজ্যের আয়তন ৩,৬৪৮ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা—সাড়ে তিনলক্ষ। মালয় আড়াই লক্ষ, চীনা ৬০ হাজার, ভারতীয় ৫০ হাজার। অধিবাসী প্রায় সমস্ত মুসলমান।

কেদা

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামরাজ ও ব্রিটিশের মধ্যে এক রাজনৈতিক সন্ধি হয়। ইহা ব্যাঙ্কক-সন্ধি নামে খ্যাত। এই সন্ধি অনুসারে কেদা, পার্লিস্, কেলান্তান ও ত্রেঙ্গানু রাজ্য শাসন-ভার ব্রিটিশের উপর পড়ে।

ধান, রবার নারিকেল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পেনাং হইতে রাজধানীর দূরত্ব ৬০ মাইল। এখান হইতে ডাচ্ বিমান-ডাক ভারতবর্ষে আসা-যাওয়া করে। একজন ব্রিটিশ মন্ত্রণাদাতার সাহায্যে মুসলমান সুলতান রাজ-কার্য্য পরিচালনা করেন। সামসাম জাতি শ্যাম ও মালয়ের

সংমিশ্রণে উদ্ভুত। তাহারা পার্লিস্ ও এই রাজ্যে বাস করে। সকলেই মুসলমান।

ইহা মুসলমান শাসিত দেশীয় রাজ্য। মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমে বিস্তৃত। লোক-সংখ্যা—৫০,০০০ হাজার। আয়তন—৩১৬ বর্গমাইল। তিন চতুর্থাংশ অধিবাসী মুসলমান। রাজধানীর নাম—কাঙ্গার। ব্রিটিশ পরামর্শদাতার সাহায্যে সুলতান দেশ-শাসন করেন। রাজপ্রাসাদ রাজধানীতে বর্ত্তমান। সুলতানের নিজস্ব ডাক-টিকিট আছে।

পার্লিস

মৎস্য, ডিম, হাঁস, মুর্গী. ধান প্রভৃতি এখান হইতে প্রভুত পরিমাণে বিদেশে চালান হয়। ব্রিটিশ পরামর্শ দাতাকে ধরিয়া ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ৪ জন।

ইহা সুলতান শাসিত দেশীয় রাজ্য। আয়তন—৫,৭১৩ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা—৪ লক্ষ। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ১২ জন। তন্মধ্যে, ১০ জন মালয় সর্দ্দার, একজন ব্রিটিশ মন্ত্রী এবং অন্যজন সহকারী মন্ত্রী। রাজধানী কোটা-বাহরু। প্রধান বন্দর—তুম্পাৎ। প্রতি বৎসর প্রায় ২২ লক্ষ মণ ধান্য উৎপন্ন হয়। সুপারি ও নারিকেল প্রচুর জন্মে। টিন ও সোনা দেশের খনিজ সম্পদ। চারু-শিল্পে মেয়েরা

কেলান্তান

অভ্যস্ত। বিদেশী পর্য্যটক ইহাদের শিল্পজাত দ্রব্য-সম্ভার আগ্রহ সহকারে কিনিয়া থাকেন।

ইহা মালয় উপদ্বীপের পূর্ব্বভাগে বিস্তৃত। পরিমাণ-ফল—৬,০০০ হাজার বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা—প্রায় ২ লক্ষ। রাজধানী কুয়ালাত্রেঙ্গানু। এই রাজ্যের মধ্যে রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। নগরের প্রান্ত দিয়া ত্রেঙ্গানু নদী প্রবাহিত।

ত্রেঙ্গানু

উৎপন্ন দ্রব্য—কাফি, রবার, নারিকেল ও মরিচ।

খনিজ দ্রব্য—টিন, উলফ্রাম, গ্রাফাইট, ম্যাঙ্গানাইট এবং পেট্রোলিয়ম।

আমদানী জিনিস—চিনি, কাপড় ও তামাক।

মালয় ভাষায় আরবী অক্ষরে লিখিত বহু প্রাচীন একখানা প্রস্তর ফলক পাঠে জানা যায়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আরবীয় মুসলিম প্রচারকগণ এদেশে আসিয়া মিশন স্থাপন করেন। এই শিলালিপিখানা সমগ্র ম্যালেশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে। ইহার ঐতিহাসিক গৌরব বিরাট। দেশীয় সুলতান ইংরাজ এডভাইসরের সাহায্য লইয়া রাজকার্য্য চালাইয়া থাকেন।

ভারতবর্ষ হইতে ২,৪০০ শত মাইল দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগর। লোক-সংখ্যা—৩ লক্ষ।

প্রায় সকলে মুসলমান। মুসলমান সুলতান দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহায়তায় শাসন-কার্য্য পরিচালনা করেন। মালয় গবর্ণমেণ্ট সিংহলকে কর দেয়।

মালয় দ্বীপপুঞ্জ

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নগর পেলেমবাং ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জাভানীজ কর্ত্তৃক ধ্বংস হয়। এ-দেশের নারীরাই সংসারের কর্ত্রী। ইহারা দেখিতে অনেকটা মঙ্গোলীয়দের মত। ইহাদের গায়ের রঙ্ উজ্জ্বল-কটা। চীনা ও ভারতীয়রা এ-দেশে বহু শতাব্দী হইতে ব্যবসায় করিতেছে। অনেকে মালয়-নারী বিবাহ করিয়া দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছে।

মালয় রবার, অর্দ্ধ পৃথিবীর চাহিদা পূরণ করে। টিন, দুই তৃতীয়াংশ পৃথিবীর চাহিদা মিটায়। গাটাপারচা, কোপরা, টাংস্টেন, উলফ্রাম এবং অন্যান্য বহু দ্রব্য দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। এখান হইতে কেদা, পেনাং, জোহোর ও সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত মিটার গেজ রেল্ওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে। একখানা দ্বিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেস্ ট্রেণ ব্যাঙ্ককে যাইয়া শ্যামের রয়্যাল ষ্টেট রেলওয়ের সহিত মিলিত হয়। সিঙ্গাপুর ও পেনাং-এর মধ্যেও যাতায়াত করে।

মালয়ের একটী রাস্তাকে পৃথিবীর সমুদয় শ্রেষ্ঠ রাস্তার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে

শ্যাম রয়্যাল ষ্টেট রেলওয়ে

রাজকীয় ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক এই রাস্তা মাটাং হইতে লরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সেই সময় হইতে এ-পর্য্যন্ত সরকার

কমপক্ষে ৩,৪৭৩ মাইল মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য ৩০।৪০ মাইল প্রশস্ত করিয়া জনশূন্য কুমারী-কানন কাটিতে
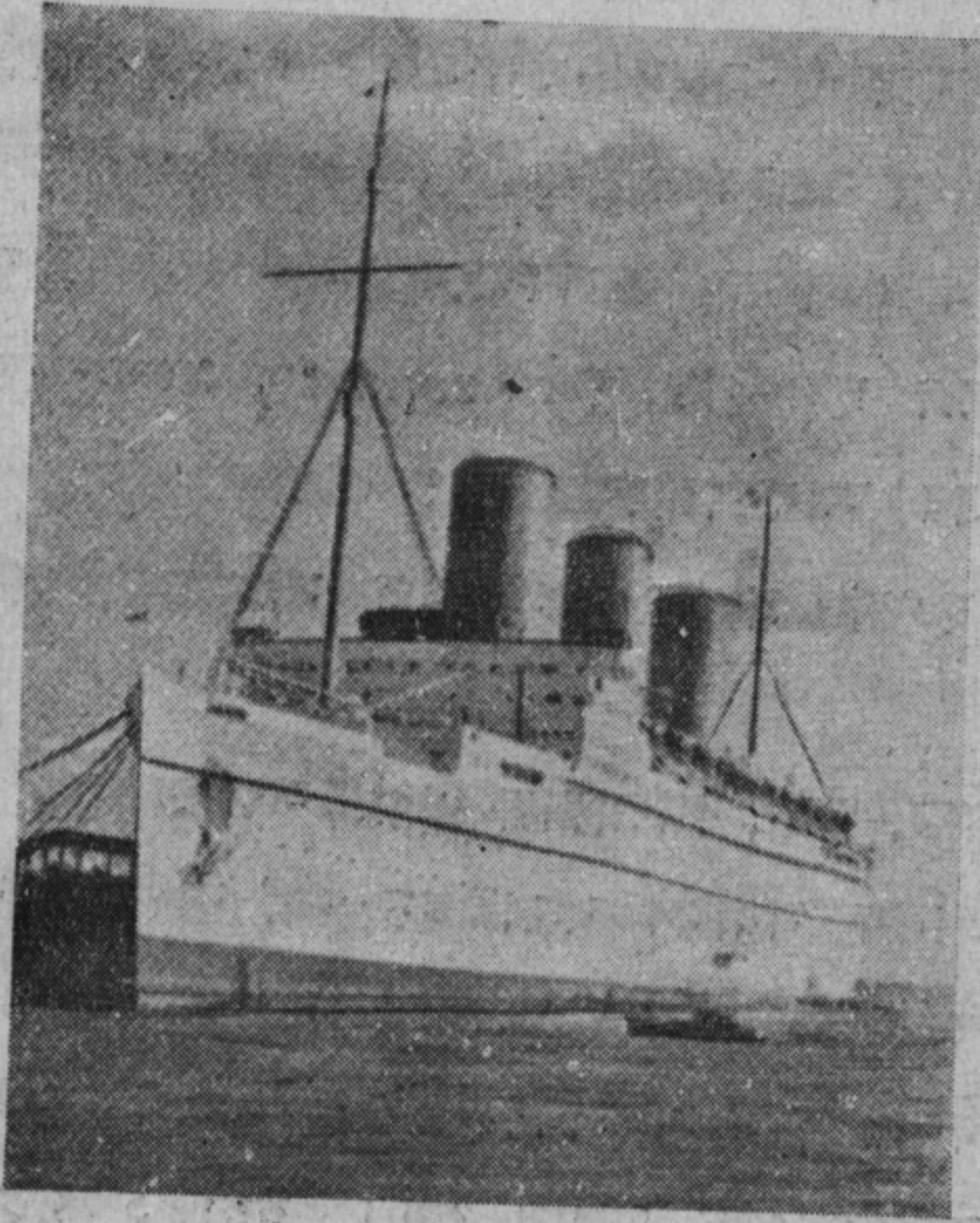
বোর্ণিওগামী জাহাজ

হইয়াছে। ব্রিটিশ-মালয়ের মার্ব্বেল গ্রাণাইট ও ল্যাটেরাইট রাস্তার বিষয় যাঁহারা জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন; ইহা মোটেই অতিরঞ্জিত নহে। ব্রিটিশ-

মালয়, জাভা, ফরাসী ইণ্ডো-চায়না, সুমাত্রার অংশ বিশেষ এবং সিংহলের মোটর-রাস্তা সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বিখ্যাত।

ব্রিটিশ-মালয় হইতে সমগ্র বন্দর এবং ব্রিটিশ-উত্তর বোর্ণিও পর্য্যন্ত ব্লু-ফানেল-ফ্যামিলির জাহাজ সদা-সর্ব্বদা যাওয়া-আসা করে।

ব্রিটিশ প্রজা ব্যতীত সকলকেই মালয় পৌঁছিয়া এবং বিদায়কালে ছাড়-পত্র (Passport) দেখাইতে হয়। ছাড়-পত্রের অধিকারীকে স্বয়ং প্রধান পুলিস অফিসে উপস্থিত হইয়া প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার সহি করাইয়া লইতে হয়।

আফিম, সুরা, আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য অস্ত্র ব্যতীত কোন জিনিস পরীক্ষা করা হয় না, বা তাহার উপর বাণিজ্য-শুল্ক বসানো হয় না। টিন ও রবার বিদেশে চালান দিবার সময় শুল্ক দিতে হয়। একশত ১০০ সেণ্টে একটী রূপার ষ্ট্রেট ডলার হয়। ইহা ২ দুই শিলিং ৪ চারি পেন্সের সমান এবং আমেরিকা-মুদ্রার ৫০ পঞ্চাশ সেণ্ট্।

দশ সেণ্ট্, এক, পাঁচ ও দশ ডলারের কাগজের নোট ও চলে। পাঁচ, দশ, কুড়ি ও পঞ্চাশ সেণ্ট্ রৌপ্য-মুদ্রাও

প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক শহর ও গ্রামে ডাক এবং টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা আছে। বড় বড় শহরে সামুদ্রিক তাড়িৎ বার্ত্তা ও টেলিফোনের বন্দোবস্ত বিদ্যমান।

ব্রিটিশ-মালয়, বিষুব-রেখার নিকটে বলিয়া উষ্ণ প্রধান। সুতরাং সকাল ৮টা হইতে ৪-৩০টা পর্য্যন্ত সান হ্যাট, অথবা টুপী পরা ভাল। দেশীয় চাকরগণ চীন ও মালয় ভাষায় কথা কহে। ব্রিটিশ-ভারতের ইংরাজী জানা অনেক গাইডও পাওয়া যায়। তাঁহারা পর্য্যটকদিগকে প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্যগুলি দেখাইয়া থাকেন। মালয় মোটর ড্রাইভারগণ চলনসই ইংরাজী বুলি আওড়াইতে পারে। মালয় দ্বীপের বাসিন্দারা নৌ-বিদ্যায় ওস্তাদ। অনেকে ব্যবসায়ী।

সেলিবেস্ দ্বীপের পূর্ব্বে মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ জুড়িয়া রহিয়াছে। বহুসংখ্যক দ্বীপ, তন্মধ্যে, হালমাহেরা সমৃদ্ধিশালী। আয়তন—৬,৭০০ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা— ২ লক্ষ। এখানকার অধিবাসী দুই শ্রেণীর। আধুনিক মালয়, সকলেই মুসলমান। আদিম অসভ্যজাতিও বাস করে। সমগ্র দ্বীপের রাজধানী—তির্ণাতে। শাসনকর্ত্তা একজন মুসলিম সুলতান। প্রাচীনকাল হইতে বংশ পরম্পরায়

মালাক্কা

সুলতানের জ্যৈষ্ঠ পুত্র রাজ্য-শাসনের ভার পাইয়া আসিতেছেন। এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা সেকান্দার ইস্কান্দার শাহ্। এখানকার মালাক্কা বৃক্ষের নিম্নে শাহজাদা অনন্ত শয্যায় শায়িত আছেন বলিয়া এই বৃক্ষের নামানুসারে শহরের নামকরণ হইয়াছে—মালাক্কা।

মালাক্কা (১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) ইয়োরোপীয়দের দ্বারা অধিকৃত প্রাচীর প্রাচীনতম শহর। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ নাবিক আলবুকার্ক ইহা অধিকার করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজরা কিনিয়া লন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হয়। অতঃপর, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ নূতন বন্দোবস্তীতে সুমাত্রার বিনিময়ে ইহা ইংরাজকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

মালাক্কা শহর ছোট এবং রাস্তাগুলি সঙ্কীর্ণ হইলেও হীরেণ ও জোঙ্কার ষ্ট্রীটদ্বয় বস্তুতঃ নয়নাভিরাম। হীরেণ ষ্ট্রীটের প্রত্যেক বাড়ী নূতন নূতন পরিকল্পনায় নির্ম্মিত। শহরের অধিকাংশ বাড়ীর মালিক চীনা ব্যবসায়ী।

ষ্টাডাহুস্ নামক ডাচ্ তীর্থ, ক্রাইষ্ট চার্চ্চ শহরের মধ্যে অবস্থিত। ইহা the Apostle of the East ডাচ্ কর্ত্তৃক ইহা ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। তাহাদের অধিকৃত রজত অলঙ্কাররাজি দৃষ্টি

আকর্ষক। জেটী হইতে মালাক্কা শহরের দৃশ্য অতীব চমৎকার। পর্ত্তুগীজ সেণ্টপল চার্চ্চের ধ্বংসাবশেষ, নিম্নের ডাচ্ নির্ম্মিত গৃহাদি, পশ্চাতে অবস্থিত কৌতূহলোদ্দীপক এশিয়াটিক টাউন, দক্ষিণে প্রাচীন তোরণ, বাড়ীঘর এবং ক্লাব পাহাড়ের উপর হইতে ছবির ন্যায় সুন্দর দেখায়। সেণ্ট জন হিলের উপর প্রতিষ্ঠিত পর্ত্তুগীজদের প্রাচীন দুর্গ অন্যতম দর্শনীয়। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত পর্ত্তুগীজদের সেণ্ট পিটার চার্চ্চ শহরের প্রান্তভাগে, চীনাদের কবরখানা বুকিত-চায়না নামক রাস্তার পার্শ্বে বর্ত্তমান। রেল ষ্টেশন, চাইনিজ ক্লাব, মসজিদ, ক্লক টাওয়ার, হিন্দু মন্দির, পর্ত্তুগীজ গির্জ্জার ধ্বংসাবশেষ, সেণ্টপল হিল্, প্রাচীন ভি-ও-জে-সি গেট, ওলন্দাজ ধ্বংসাবশেষ, মালাক্কা ক্লাব, রবার ফ্যাক্টরী, ফ্রেঞ্চ কন্‌ভেণ্ট, মেথোডিষ্ট চার্চ্চ রোমান ক্যাথলিক চ্যাপেল, সেণ্ট জেভিয়ার স্কুল, মেথোডিষ্ট স্কুল প্রভৃতি মালাক্কার দ্রষ্টব্য।

।।।াক্কা বেত, ঝুড়ি, লেস্ জগদ্বিখ্যাত। শহরের কয়েকটি বিশিষ্ট দোকানে এগুলি বিক্রয়ার্থ মওজুদ থাকে।

ক্লাবের অনতিদূরে গবর্ণমেণ্ট আরাম-সৌধ—সমুদ্রকূলে প্রতিষ্ঠিত। পর্য্যটকগণ এখানে থাকার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরে, এই দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপের পরিমাণ-ফল—যথাক্রমে, ৪,৪৬০ এবং ১,৭৭৩ বর্গমাইল। মালয় মুসলিমের সংখ্যা—দুই তিন লক্ষের অধিক নহে। উৎপন্ন দ্রব্য—কয়লা ও টিন।

বাঙ্কা ও বিল্লীটন

জাভা সংলগ্ন ক্ষুদ্র দ্বীপ। জন-সংখ্যা—কুড়ি লক্ষ। এই দ্বীপ ছোট হইলেও বেশ উন্নতিশীল। দেশের অধিবাসীরা সদালাপী ও অতিথি-পরায়ণ। ইহারা নিরীহ ও শান্তশিষ্ট।

মাদুরা দ্বীপ

এই দ্বীপ গর্ত্তুগীজদের অধিকৃত। লোক-সংখ্যা—প্রায় ৬ লক্ষ। অধিবাসী প্রায় সব মুসলমান। এখানে কাসকাস, বন বিড়াল, টীয়াপাখী, সজারু, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি পশু-পক্ষী বিচরণ করে। ধান ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। মালয় পলিনেশিয়ান এবং পাপুয়া হইতে উদ্ভুত বংশধরও কিছু কিছু বাস করে। Timor Archipelago are transitional regions···In Timor a mersupial, the cus-cus exists, but not the Kangaroo. Here also is a species of the cat tribe. টাইমোর স্বাস্থ্যকর স্থান।

টাইমোর

মালয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সেলিবেস্ অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীপ; দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত এবং পশ্চিমে নয়নাভিরাম ম্যাকাসার

টাইমো র জঙ্গলের প্রাণী

প্রণালী দ্বারা বিভক্ত। পশ্চিমে পাপুয়া, পূর্ব্বে বান্দা-সমুদ্র ; মধ্যস্থলে স্পাইস্ দ্বীপ। বিচিত্র

সেলিবেস

সেলিবেস্ দ্বীপের আয়তন—৭০,০০০ হাজার বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা—২০ লক্ষ। ইহার পূর্ব্ব-দিকের সাগর-উপসাগরের দৃশ্য অতীব মনোরম। উন্নত পর্ব্বত শ্রেণীর কোন কোন স্থান সমুদ্র তীর অবধি নামিয়া আসিয়াছে—এ-স্থানের স্বভাব-শোভা দর্শকের হৃদয়-মন উৎফুল্ল করে। ইহার জল-বায়ু সুমাত্রা ও জাভার অনুরূপ।

মালয় গোত্রজাত ম্যাকাসার, মান্দার, বুগী প্রভৃতি উপজাতি এ-দ্বীপে বহু শতাব্দী ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। সেলিবেস-এর অরণ্যময় অঞ্চলে টোরাড-জাস্ নামীয় অর্দ্ধ অসভ্যজাতি বাস করে। ইহারা জাজাবর শ্রেণীর এবং অদ্ভুত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহা ছাড়া মিনাহাসান্স্ নামক আর একটী খ্রীষ্টানজাতি এখানে দেখা যায়। ইহারা খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে দক্ষিণ-এশিয়ার কোন বিশেষ জাতির বংশধর মনে করেন। অধিবাসীর মধ্যে বেশীর ভাগ মুসলমান। তবে, সমগ্র জাতির মধ্যে পূর্ব্বোপকূল-বাসী বুগী সম্প্রদায় ধনে, মানে ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ নৌ-বিদ্যায় ইহাদের পারদর্শিতা অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

উপসাগরের দৃশ্য

৬
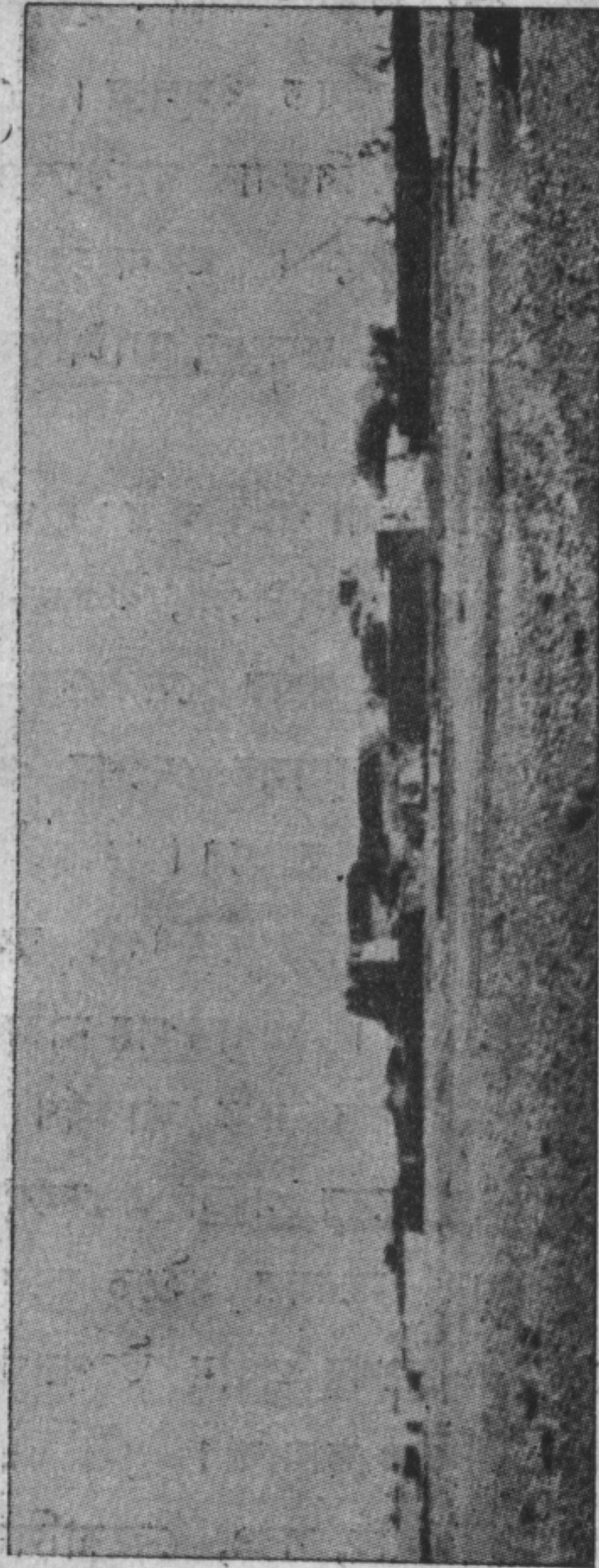
মেয়েরা সুন্দরী এবং সুরুচিসম্পন্না ; ইহারা সারং বস্ত্র বয়ন করে। বুগীদের ধর্ম্মমত ইস্‌লাম। সেলিবেস-এর রাজধানী ম্যাকাসার-এ বিদ্যমান থাকিলেও সুলতানের প্রাসাদ গোয়া নামক স্থানে। ওলন্দাজের শাসনাধীনে যতগুলি পোতাশ্রয় আছে, তন্মধ্যে, ব্যাটাভিয়া প্রথম এবং ম্যাকাসার-এর স্থান দ্বিতীয়।

সেলিবেস-এর ডোঙ্গালা পল্লী ক্ষুদ্র হইলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রাণী। গোরোন্‌টোলো, পর্ব্বত-বেষ্টিত একটী রমণীয় স্থান। মেনাডো, উত্তর সেলিবেস্-এর অন্যতম সুদৃশ্য নগর। ইহা মিন্‌হাসর দেশের প্রধান বন্দর। বাসিন্দা-সংখ্যা—১২,০০০ হাজার। শহরটী সুন্দরভাবে সুরক্ষিত। রাস্তার দুইধারে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষসারি ক্লান্ত পথিককে ছায়া দান করে। এখানকার নারীজাতির সুশ্রী চেহারা বিদেশী পর্য্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক প্রকার অদ্ভুত দর্শন মহিষের গাড়ী এ-দেশের বিশেষত্ব। জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর। নবেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত খুব বর্ষা নামে। এ-দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য : ধান, ভুট্টা, তূলা, ইক্ষু, চিনি ও তামাক।

খনিজ পদার্থ : লৌহ, লবণ, কেরোসিন এবং স্বর্ণ। ঘোড়া ও গরু এ-দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ইহা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। বালিদ্বীপের পূর্ব্ব-

সেলিবেস্-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য
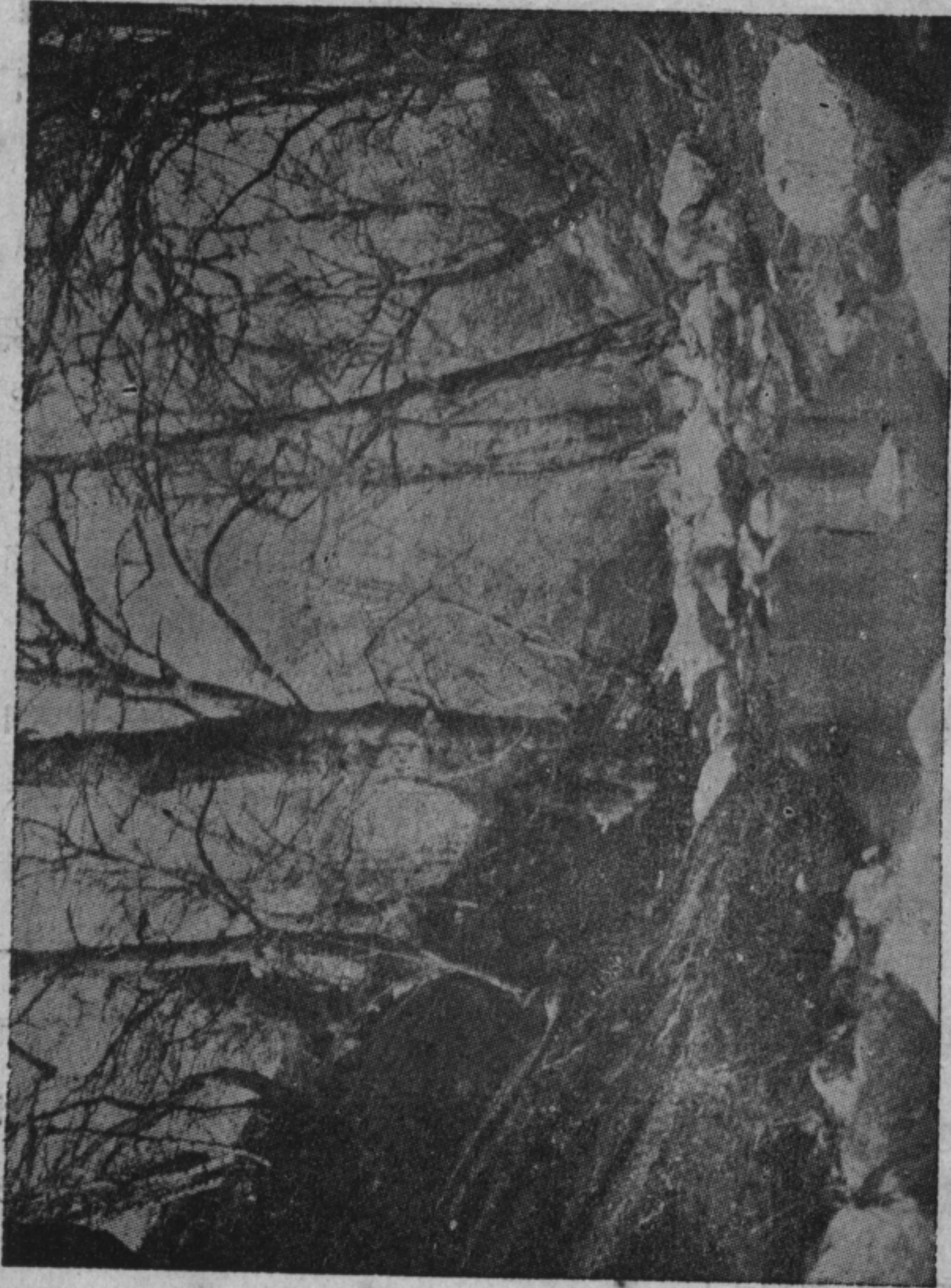
প্রান্তে অবস্থিত। ক্ষুদ্র দ্বীপ বলিয়া পর্য্যটকগণ বড় একটা এখানে আসেন না। ডাচ্-ইণ্ডিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পর্ব্বত এই দ্বীপে বিদ্যমান। জিগুনোয়েং বিনোলজামি নামে এই পর্ব্বত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

লম্বক

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ১২,৫৫০´ ফিট।

পর্য্যটকগণ জাহাজ-যোগে আমপেনান্ নামক স্থানে অবতরণ করেন। ইহা মাতারাম্-এর রাজধানী। এই দ্বীপবাসীরা বালি-অধিবাসীর ন্যায় সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করে। স্থানীয় হোটেলগুলি অস্থায়ী হইলেও নরমদা নামক স্থানে বিদেশী ভ্রমণকারীর আহার ও বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা আছে।

ইহা মালয় দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বপূর্ব্বপ্রান্তে বিরাজিত। এই দ্বীপের পশ্চিম অংশ হল্যাণ্ডের অধিকৃত এবং পূর্ব্বভাগ ব্রিটিশের শাসনাধীনে। অনেক

পাপুয়া

কৌতূহলী ভ্রমণকারী এই দ্বীপে চড়ুই-ভাতি (Picnic) করিতে আসিয়া থাকেন। বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া বিধাতা এই দ্বীপে ঢালিয়া দিয়াছেন। দ্বীপের উৎপন্ন দ্রব্য : ইক্ষু, কদলী ও নারিকেল প্রধান।

ইহা একটী রহস্যময় ক্ষুদ্র দ্বীপ। প্রথম দর্শনে এই দ্বীপকে একটী আগ্নেয়গিরি বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার

জিগুনোয়েং বিনোলজামি পর্বত

উত্তরপ্রান্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া সমুদ্রের বেলাভূমিতে মিশি-য়াছে। এই পর্ব্বতের ঢালুভূমির উপর নাটমেগ্ এবং লভ গার্ডেন শহরদ্বয় প্রতিষ্ঠিত। ইহার উচ্চতা ৫,০০০´ হাজার ফিট। বিগত চারি-পাঁচশত বৎসরের মধ্যে এই পর্ব্বতে পঞ্চাশবারের অধিক অগ্ন্যুদ্গম হইয়াছে। যে কেহ শ্রম স্বীকার করিলে এই দুরন্ত পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে পারে। তবে, সাহসী ও শক্তিধর পুরুষও উপরিভাগে উঠিয়া গন্ধকের উগ্র-গন্ধে শক্তি হারাইয়া মুষড়িয়া পড়ে। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত দুর্গ এখানকার অন্যতম বিশেষ দ্রষ্টব্য।

টারনেট্

টারনেট্-এর সুলতানের প্রাসাদ, অধুনা মিউজিয়াম-এ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যস্থ বহু দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে বালি, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের বাদ্যযন্ত্র, মৎস্য ধরিবার বিচিত্র সরঞ্জাম, দেশীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দ্রব্য, অতীতদিনের অলঙ্কার, তৈজস-পত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিগত ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়।

টারনেট্-এর অরণ্যে বাহাদুরী, আবলুস্ প্রভৃতি অনেক মূল্যবান বৃক্ষ দেখা যায়। লাইসেন্স্ করিয়া সেই সব কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হয়।

ভারত মহাসাগরীয় মালয়দ্বীপপুঞ্জে যতগুলি দ্বীপ

আছে, বোর্ণিও তন্মধ্যে দ্বিতীয় বড় দেশ। ইহার

বোর্ণিও

পরিমাণ ফল—২,৯০,০০০ দুই লক্ষ নব্বুই হাজার বর্গমাইল। চীন-সাগর,

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

জাভা-সাগর, সেলিবেস্-সাগর ও ম্যাকাসার-প্রণালী সমগ্র দ্বীপটীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা,

জাভা, সেলিবেস্, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপ হইতে জাহাজযোগে বোর্ণিও পৌঁছা যায়। ওলন্দাজ, ইংরাজ ও মুস্‌লিম স্থলতান, এই ত্রিশক্তি কর্তৃক দেশ শাসিত হয়। সমগ্র দ্বীপের তিনভাগের ছুই ভাগ ওলন্দাজের ও একভাগ ইংরাজের। ইংরাজের অধিকৃত স্থানের মধ্যে স্থল্‌তানের শাসনাধীনে ছুইটী দেশীয় রাজ্য আছে। মুস্‌লিম-বোর্ণিওর ভূমির আয়তন—৪,০০০ চারি হাজার বর্গমাইল। জন-সংখ্যা—একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার। স্থল্‌তানকে রাজকীয় শাসন-সংক্রান্ত পরামর্শ দিবার জন্য একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্ নিযুক্ত আছেন। মুস্‌লিম-বোর্ণিওর স্থল্‌তানের রাজধানী সাগরকূলে অবস্থিত। ইহা শ্রেষ্ঠ বন্দর।

সারওয়াকের রাজা ইংরাজ। রাজার মূর্ত্তি অঙ্কিত মুদ্রা স্বীয় রাজ্য মধ্যে চলে। কয়েক বৎসর আগে রাজ-পরিবারের যুবরাজ সিম্পসন ও রাজকুমারী দায়াংমুদা স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ডক্টর খালেদ শেল্‌ড্রেক্ ও নও-মুস্‌লিম বার্কলের সহিত ভারত-ভ্রমণকালে ইস্‌লামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ এই বৃহৎ দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ক্রমে, ইংরাজ নাবিকগণ বাণিজ্যার্থ এখানে

আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে থাকেন। পরবর্ত্তীকালে বোর্ণিওর এক তৃতীয়াংশ ইংরাজের অধিকারে আসে। কাপুয়া পর্ব্বত শ্রেণী ওলন্দাজ-বোর্ণিও ও ব্রিটিশ অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ সমতল ও জলাভূমি এবং দুর্ভেদ্য অরণ্যে ঢাকা। শিকারীরা বলে—পৃথিবীতে যত প্রকার অদ্ভুত জানোয়ার আছে, তাহার অধিকাংশ বোর্ণিও-জঙ্গলে পাওয়া যায়। সিংহ, বাঘ, ভালুক, গণ্ডার, ওরাংওটাং, হস্তী, সজারু, রঙ-বেরঙের পাখী প্রভৃতি বহুল পরিমাণে এই দ্বীপে বিচরণ করিতে দেখা যায়। গৃহপালিত জীবের মধ্যে মহিষ, অশ্ব, গরু, কুকুর প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গাটাপার্চা, চন্দন, সেগুণ, আবলুস্ ও রঙ উৎপাদক গরাণ-বৃক্ষ জন্মে। জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী বৃক্ষও এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

দেশের খনিজ দ্রব্য : কয়লা ও কেরোসিন। সোনা-রূপা, পিতল-কাঁসার তৈজস-পত্র, বস্ত্র, কাষ্ঠ, সাগু প্রভৃতি এখান হইতে দেশ-বিদেশে রফ্‌তানী হয়। কুটির-শিল্পের প্রচলনও এতদ্দেশে দৃষ্ট হয়।

দায়াক, ডুশন, জাভানীজ, আরব, চীনা মালয়, বুগী

প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় লোক এখানে বাস করে। দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে দায়াক ও ডুশন সম্প্রদায় বাস করে। অরণ্যবাসী আদিম-জাতি উলঙ্গ জীবন যাপন করে। তাহাদের ব্যবহৃত
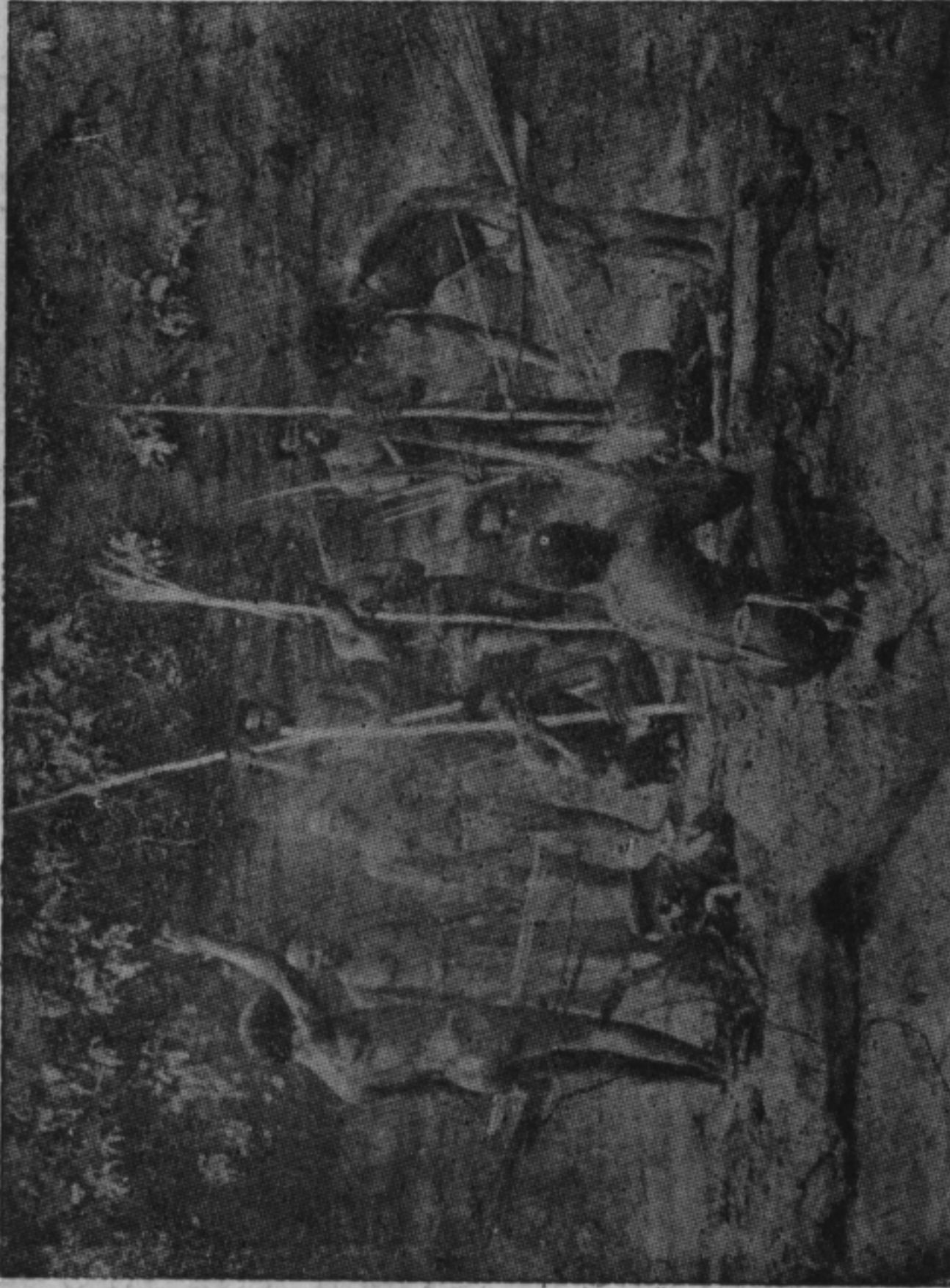
বোর্ণিও দ্বীপের নরখাদক অসভ্য-জাতি

বর্শার নাম ব্লো-পাইপ। তাহার অগ্রভাগে তীব্র বিষ মাখান থাকে। তদ্দ্বারা তাহারা বন্য-জন্তু শিকার করিয়া আহার করে। ইহারা ভূত-প্রেত পূজা করে।

সমুদ্রের উপকূলভাগে যে সমস্ত লোক বাস করে, তাহারা অধিকাংশ মালয়-প্রোবাসী মুসলিম। নৌ-বিদ্যা ও মৎস্য শিকারে ইহারা অসাধারণ পটুতার পরিচয় দিয়া থাকে। মৎস্য বিক্রয় ও চালান দিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করে, তাহাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। নদী বহুল স্থানগুলি ইহাদের খুব পরিচিত। নদীপথে ইহারা দুর্গম অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা আশঙ্কা করে না। এইসব নদীতে কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি বাস করে।

বোর্ণিওর জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত অজস্র ধারায় বর্ষা নামে। পশ্চিম বোর্ণিওর রাজধানী পোন্টিয়ানিয়াক্-এ; বৃষ্টি-পরিমাণের গড় ১২৯ই (327 C. M.)।

সমগ্র দ্বীপের মধ্যে অনেকগুলি শহর আছে। তন্মধ্যে, বাঞ্জেরমাসিন, পোন্টিয়ানিয়াক্, সাম্বাস ও সারওয়াক্ প্রধান। এ-সমস্ত শহরে আরব, মাদ্রাজ, সেলিবেস্-প্রবাসী বোর্ণিয়ান অবস্থিতি করে। দেশীয় অসভ্য-জাতির মধ্যে কয়েকটী সম্প্রদায় আছে: কায়ান, উলুক, নাগজু, নোমাডিক। এতদ্ব্যতীত, পশ্চিম দেশীয় কয়েকটী নাম-না-জানা জাতিও গহন কাননের নিবিড়তম প্রদেশে বিচরণ

করে। তাহারাও পৌত্তলিক। তাহাদের বিচিত্র জীবন-যাত্রা হয়তো কোন এক আগত দিনে সভ্য সমাজকে বিস্মিত করিবে। 'ইষ্ট অব-বোর্ণিও' ফিল্ম যদি সত্য হয়, তবে, তাহারা সৃষ্টির মাঝে একটী রহস্যময় জাতি—লোক চক্ষুর অন্তরালে অভুতপূর্ব্ব জীবন-যাপন করিতেছে। কৌতূহলী পরিব্রাজক তাহার সন্ধান রাখে না—রাখিতে ইচ্ছা করা বিপজ্জনকও বটে! অনন্ত মহাসাগরের মধ্যে বিচিত্র এ-দেশ, বিচিত্র এদের ঘর-বাড়ী এবং তাহার চাইতেও বিচিত্র এদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা!

জাভা, প্রাচ্যের স্বপ্ন-দ্বীপ। দর্শকের মনস্তুষ্টির জন্য প্রকৃতি-দেবী এখানে তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে রাস্তাঘাট, বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, রাস্তার আলোক-সজ্জা, জন-সাধারণ এবং যান-বাহনের শৃঙ্খলতা পর্য্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

জাভা

এই দ্বীপ খুব বড় না হইলেও যথেষ্ট উন্নতিশীল। পশ্চিমে সুমাত্রা, উত্তরে বোর্ণিও, উত্তর-পূর্ব্বে সেলিবেস এবং পূর্ব্বে বালি। দক্ষিণ-পশ্চিমকূল বিধৌত করিতেছে—দিগন্তপ্রসারী ভারত মহাসাগর। ঝড়-ঝাপ্টা এখানে নাই। তবে, অবিরাম বৃষ্টি পড়ে।

দ্বীপের আয়তন—৫১, ৩৩৬ বর্গ মাইল। মাদুরাদ্বীপও ইহার অন্তর্ভুক্ত। লোক-সংখ্যা—প্রায় ৪ কোটি। পশ্চিম-পূর্ব্ব ও মধ্য জাভায় তিনটি বিশেষ ভাষা প্রচলিত আছে। মালয় ভাষা এ-দেশের সার্ব্বজনিক ভাষা। এই ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হয়।

সুমাত্রার দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে সঙ্কীর্ণ সুণ্ডা প্রণালী মধ্য জাভা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জাভার পূর্ব্ব-পশ্চিমের দূরত্ব ৭০০ শত মাইল। সর্ব্বত্র ট্রেণ ও মোটরের উত্তম বন্দোবস্ত আছে।

এখানকার আব-হাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এবং ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি যথেষ্ট। তদুপরি জল সিঞ্চনের উত্তম ব্যবস্থা থাকায় এই দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শস্য-শ্যামলা। অকর্ষিত ভূমিতেও এমন সতেজ সব্জী উৎপন্ন হয় যে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তাই বলিয়া বাঙ্গালা দেশের কৃষকদের ন্যায় জাভার কৃষক অলস নয়।

সমগ্র জাভায় তাল, নারিকেল ও বাঁশ জন্মে। নারিকেল গাছ খুব দীর্ঘ হইলেও প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, রঙ-বেরঙের বাঁশের ঝাড় ঝোপ-জঙ্গলের মাঝে দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যায় ধারে গেলে গা ঝিম্ ঝিম্ করে।

জাভার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুপম। সদা প্রফুল্ল দেশবাসীর শতকরা ৯০ জন মুসলিম। অধিকাংশ মুস্লিম

জাভার নৈশ-সৌন্দর্য্য

ইণ্ডোনেশিয়ান ভাষায় কথা কহে। সুন্তানি, মাদোরী ও মালয় ভাষায়ও আবশ্যকমত আলাপ করে।

১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মজাপহিৎ শাসন-তন্ত্রের অবসান ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। ধর্ম্ম যাজকদের প্রচারের ফলে অল্পকালমধ্যেই দেশের অধি-

কাংশ অধিবাসী ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। তাহারা দ্বীপের মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে। গোঁড়া বৌদ্ধ ও হিন্দুরা বরোবত্তুর রক্ষার্থ মাটি চাপা দিয়া উপরে বৃক্ষ

জাভার মন্দির

রোপণ করিয়া দেয়। ছয়শত বৎসর ধরিয়া স্তূপ লোক চক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে, নেপোলিয়ন যুগে ব্রিটিশ-জাভার গবর্ণর ষ্ট্যামফোর্ড

র্যাফেল্‌স্‌ মাটি খুঁড়িয়া এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি লোক-চক্ষুর সম্মুখে আনয়ন করেন। অতঃপর, নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক যুদ্ধাবসানের পর জাভা হল্যাণ্ডকে প্রত্যার্পিত হয়। তখন ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট্‌ ইহার সংস্কার সাধন করেন। বর্ত্তমানে এই স্মৃতি-মন্দির প্রাচ্যের, তথা জগতের মধ্যে অন্যতম হিন্দু-শিল্পের আদর্শ শ্রেষ্ঠ নমুনা।

১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজরা জাভায় ব্যবসায় আরম্ভ করে। সাত বৎসরের মধ্যে তাহারা কারবারে প্রভূত উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের প্রভাব জাভার বিভিন্ন স্থানে ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। প্রথমে, দুই একটী ব্যবসায়ের কেন্দ্র বা ঘাঁটি, ক্রমে, গবর্ণর নিয়োগ ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা নূতন শাসনের ভিত্তি পত্তন করে। পরবর্ত্তী যুগে, নেদারল্যাণ্ড সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল—ইষ্ট ইণ্ডিস্‌, সুমাত্রা, জাভা, বালি, মাদুরা, বোর্ণিও, সেলিবেস, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপের গোষ্ঠি।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাভায় ১৬,৭৬০টী মাদ্রাসায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার ছাত্র পড়িত। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ছাত্র-সংখ্যা চারি-পাঁচ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ধর্ম্মচর্চ্চায় ভারতীয় মুস্‌লিম জাভার কাছে হার মানিয়াছে।

মাদুরাদ্বীপ লইয়া, জাভা ১৭টী প্রদেশে বিভক্ত। গবর্ণর জেনারেল এই সাম্রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা। ইয়োরোপ,

জাভাদ্বীপের যুবক-যুবতী

চীন ও আরব-প্রবাসী জাভানিজ, নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সদস্য লইয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভোল্কস্রাদ নামে একটী

ব্যবস্থাপক-সভা গঠিত হইয়াছে। ইঁহাদের সাহায্য লইয়া গবর্ণর শাসনকার্য্য চালান।

জাভায় দুইটী দেশীয় রাজ্য আছে। প্রথমটী—জোক্‌জোকার্ত্তা, স্থলতানের শাসনাধীনে। দ্বিতীয়টী—সোয়াকার্ত্তা, পৌত্তলিক হিন্দু রাজের অধীনে।

ভাইসরয়ের প্রাসাদ, রাজধানী ব্যাটেভিয়া হইতে ৩৬ মাইল দূরে বুটেনজোর্গ নামক স্থানে। এই দুই শহরের সহিত জাভা-ষ্টেট-রেলওয়ে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। শহরের সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সমুজ্জ্বল। ব্যাটেভিয়ার জন-সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। গবর্ণমেণ্ট্‌ আফিস, যাদুঘর, কলেজ প্রভৃতি এখানে প্রতিষ্ঠিত। বন্দরে ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, ডাচ্‌, জাপানী, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সকল দেশের জাহাজ ভিড়িয়া থাকে। জাভায় বহু শহর আছে, তন্মধ্যে, সৌরবাই, সোয়াকার্ত্তা, সেমারাং, ট্যান্‌জাও্‌প্রিয়ো, মেডেন প্রভৃতি প্রধান। কোনও শহরের লোক-সংখ্যা এক লক্ষের কম নহে।

বুটেনজোর্গের উদ্ভিদ-উদ্যান পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দর্শনীয়। নানাদেশের নানাজাতীয় বৃক্ষ সযত্নে রোপিত হইয়াছে। কতকগুলি বৃহৎ গাছ 'জ্যায়াণ্ট ট্রি' নামে অভি-হিত। ইহাতে ভাল ভাল তক্তা প্রস্তুত হয়। এখানকার

চিড়িয়াখানা. অর্থকরী মিউজিয়ম, স্বাস্থ্য-নিবাস দর্শন যোগ্য।

চিনি প্রস্তুতকার্য্যে জাভার স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। কিউবার স্থান প্রথম। কিন্তু, কুইনাইন জাভার একচেটিয়া ব্যবসায়। ইহা ব্যতীত, তামাক, চা, পেট্রোল, রবার প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এদেশে শ'খানেক আগ্নেয়গিরি আছে; তন্মধ্যে, কারাকাটুয়া, মেরাপি, ট্যাঙ্কোবান সক্রিয়, অনেকগুলি নিষ্ক্রিয়। কারাকাটুয়া সমুদ্র মধ্যে লুকায়িত দুষ্ট অগ্নিগিরি। ট্যাঙ্কোবানের অগ্নিগহ্বর (Cratér) দর্শকের হৃদয়ে দারুণ ভীতি সঞ্চার করিয়া দেয়। চোরা পাহাড় হইতে সর্ব্বক্ষণ অল্প-বিস্তর ধূম, লাভা, গলিত ধাতু ও গন্ধক নির্গত হইতেছে।

জাভায় একটী প্রসিদ্ধ লবণ-কূপ আছে। এই কূপ হইতে দরকার মত লবণ তুলিয়া ব্যবহার করা হয়। শহরের সর্ব্বত্র রেলপথ, ট্রাম, মোটর রাস্তা থাকায় জিনিস পত্র স্থানান্তরে পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা আছে। শিকারী-দের কাছে জঙ্গলের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী। হাতী, বন্যবরাহ, ভল্লুক, বানর যথেষ্ট। বানরদিগকে দেশবাসীরা পবিত্র মনে করে। পাহাড়িয়া ঢালু-অসমতল প্রদেশে এক শৃঙ্গ-বিশিষ্ট হরিণ বিচরণ করিতে দেখা যায়। শস্যের ভিতর

ধান্য প্রধান। ভূমি দুই প্রকার—উঁচু ও নীচু। উঁচু ভূমিকে জাভাবাসীরা টিগালস্ এবং নীচু ভূমিকে সওহাস
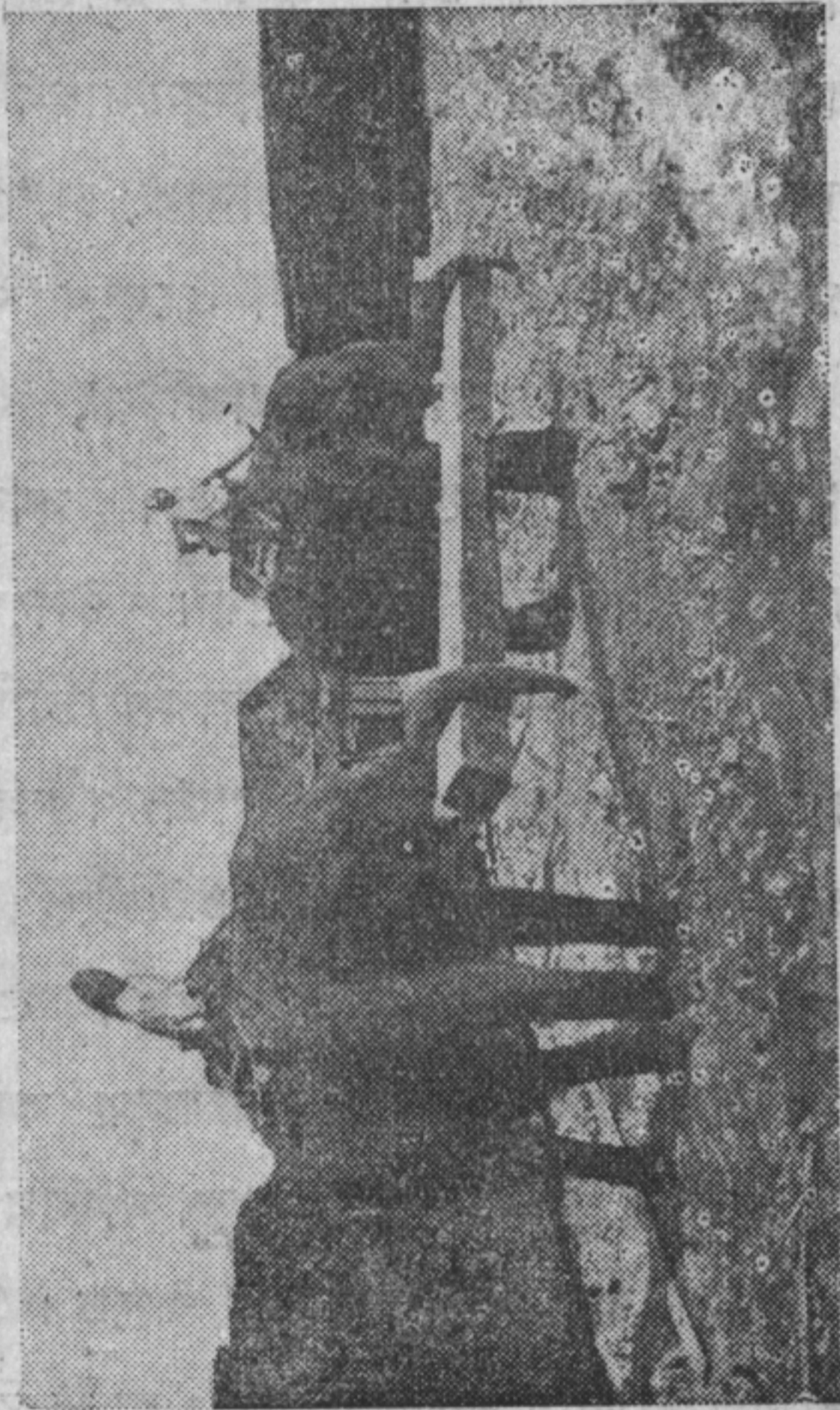
জঙ্গলের হাতী পোষ মানিয়াছে

কহে। বারিবর্ষণে উঁচু ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হয়, নীচু ভূমিকে সেচন-প্রথায় উর্ব্বর করাই সঙ্গত। নীচু ভূমিতে যখন ধানের অঙ্কুর দেখা যায়, তখন মনে হয়, সমস্ত ক্ষেত্রটী

হলুদমণ্ডিত। চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ বর্ণ ধারণ করিতে থাকে। কৃষকদের মনে তখন আনন্দ আর ধরে না। স্ত্রী-পুরুষ সবাই দিনের কর্ম্ম অবসানে মনের আনন্দে গান ধরে। সে আনন্দোল্লাসের শেষ নাই। নিশীথ চাঁদিনী রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায় সমানে, নৃত্য-নূপুর ধ্বনিতে। মাটির রঙ পিঙ্গল বর্ণ, স্থানে স্থানে গাঢ় লাল্‌চে। মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তি অত্যন্ত বেশী। ধান্য ফসলের পরেই চিনি এবং চা-এর স্থান। কাফি, কোকো, ক্যাসাভা প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্টিকর শাক্-সব্‌জীও পাওয়া যায়। খনিজ টিন, পেট্রোল বিভিন্নদেশে চালান দিয়া দেশবাসীরা যথেষ্ট লাভবান হয়।

কর্ণেলেস্ প্রতিষ্ঠিত ওয়েল্‌টাভ্রেডেন, ব্যাটাভিয়া শহরের একটী বিশিষ্ট স্থানের নাম। বিস্তৃত রাস্তার পার্শ্বে প্রাসাদসম অট্টালিকাসমূহ, সাধারণ ভ্রমণোদ্যান, প্রতীচ্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ শহরের সহিত তুলিত হইতে পারে। যাদুঘরটির নাম—ব্যাটাভিয়ান সোসাইটী-অব-আর্টস্ এণ্ড সায়েন্স্। দেশের শিল্প-জাত দ্রব্য-সম্ভার, প্রাচীন ঐতিহাসিক অস্ত্র, তৈজস-পত্র, খনিজ পদার্থ, পার্ব্বত্য জিনিস প্রভৃতি রক্ষিত হইতেছে। তাল পাতার পুঁথিও দেখা যায়।

এখানকার মন্দির গাত্রে রামায়ণী যুগের বহু ঘটনা উৎকীর্ণ আছে। এইসব মন্দির চারি-পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন। এদেশে তখন হিন্দু রাজাদের প্রভাব পুরামাত্রায়

জাভার বৌদ্ধ-মন্দির ও মূর্ত্তি

বজায় ছিল। রাজা আজিসাকার শাসন সময় জাভাকে ভাঙ্গিয়া চারিভাগ করা হয়। উত্তরকালে, ইহা পাজাজারাণ

নামে একটী স্বতন্ত্র-রাজ্যের অধীন হয়। ১৩৭৯ হইতে ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের নাম থাকে—মাজাপ-হিত। ক্রমে, আরবগণ বাণিজ্যার্থ এদেশে আসেন এবং সুযোগ বুঝিয়া রাজ্য-বিস্তারে মনঃসংযোগ করেন। সুমাত্রার পরেই জাভার উপর আরবদের প্রভাব বিস্তারিত হয়। তারপর, পাশ্চাত্যের বণিকদল আসিতে লাগিল দলে দলে। দেশের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিক্ষোভ দেখিয়া তাহাদের মতলবের পরিবর্ত্তন হইল—তাহারা চাহিল, দেশটীকে গ্রাস করিতে। পরবর্ত্তীকালে সেইসব সাম্রাজ্যবাদীর হাত থেকে জাভার স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব হইল না—চিরদিনের জন্য বিদেশীর শাসনাধীনে চলিয়া গেল। সেই হইতে জাভায় উড়িতেছে, বিদেশীর বিজয়-পতাকা—পত্‌ পত্‌ করিয়া।

শ্যাম-রাজ্যে আজিও রাজতন্ত্র বিরাজমান। ব্রিটিশ ও ফরাসী অধিকৃত শান ষ্টেট এবং ফরাসীর লুয়াংপ্রবাং-এর

শ্যাম

অন্তর্গত লাও ষ্টেট-এর পর হইতে এই রাজ্য বিস্তৃত। ফরাসীর লাওস্ ও কম্‌বোডিয়া ইহার পূর্ব্ব-সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। পশ্চিমে ব্রিটিশ শান ষ্টেট এবং লোয়ার বর্ম্মা; দক্ষিণে শ্যাম-উপসাগর এবং ব্রিটিশ মালয়। রাজ্যের পরিমাণফল—২,০০,০০০ লক্ষ বর্গমাইল।

উত্তর-শ্যাম, পর্ব্বত-সঙ্কুল। ইহার উচ্চতম শিখর দোই (Doi)-এর উচ্চতা ৮,৪৫০´ ফিট। রাজ্য মধ্যস্থিত সমস্ত পর্ব্বত অরণ্যাবৃত। তথা হইতে প্রচুর সেগুণ কাষ্ঠ, রাজধানী ব্যাঙ্ককে রফ্‌তানী হয়। উত্তর-শ্যামের একটী পর্ব্বত হইতে এশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত মেনাম নদীর উৎপত্তি হইয়া ব্যাঙ্কক শহরের পার্শ্ব ধৌত করিতেছে।

মধ্য-শ্যাম হইতে একটী উত্তুঙ্গ পর্ব্বত উঠিয়া ব্রহ্মদেশের সীমা-নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার পশ্চিমপ্রান্তের বিশাল সমতলক্ষেত্রের পরিমাণ ফল—৫৫,০০০ হাজার বর্গমাইল। পৃথিবীর মধ্যে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ উর্ব্বর ধান্য ক্ষেত্র। যে পর্ব্বত দক্ষিণ-শ্যাম ও ব্রহ্মদেশকে বিভক্ত করিতেছে, তাহার উচ্চতা ২,০০০´ হাজার হইতে ৪,০০০´ হাজার ফিট। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা এত সুন্দর যে, চতুর্দ্দিকে একবার চোখ ফেলিলে আর উঠাইতে ইচ্ছা হয় না। চির-সবুজ জঙ্গলের মধ্যেস্থিত তমাল বৃক্ষ ও সোনার বরণ বালু-বেলাভূমির দিকে একবার চাহিলে অতীতের সমস্ত ব্যথা-বেদনা ক্ষণিকের জন্য ভুল হইয়া যায়।

হরিণ, বানর, কুকুর, বন-বিড়াল, বাঘ, চিতাবাঘ, গেছো চিতাবাঘ, ছোট কেঁদো, দ্বিখড়্গা গণ্ডার, হাতী,

টেপির প্রভৃতিও নিবিড় অরণ্যে বিচরণ করে। হরিণ, কুয়াং, রুছা, বাইসন, গাউর, বন্য ষাঁড়ও দেখা যায়।

আরানিয়াপ্রেড্‌স্। রাজধানী ব্যাঙ্ককের পূর্ব্ব ও কম্বোডিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। ইহা ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল।

আউথিয়া। ব্যাঙ্কক হইতে রেলপথে ৭৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা শ্যামের প্রাচীন রাজধানী,—অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত। বিধ্বস্ত ছাদহীন প্রাচীন মন্দির মধ্যে স্থাপিত বুদ্ধের ব্রঞ্জমূর্ত্তি দেখার যোগ্য।

ব্যাঙ্কক। শ্যামের রাজধানী। প্রাচীন রাজধানী আউথিয়া বর্ম্মণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইলে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন রাজধানা স্থাপিত হয়। লোক-সংখ্যা—৬,৫০,০০০ ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। মেনাম নদীর জল সমগ্র ব্যাঙ্কক শহরে সরবরাহ হয়। ব্যাঙ্ককের একটী খাল বা ক্লংস্ প্রাচীর ভিনিস্ (Venice of the East) নামে কথিত। ক্লংস্-এর ভাসমান বাড়ী ও দোকান বিদেশী পর্য্যটকের দৃষ্টিতে সম্পুর্ণ নূতন লাগে।

প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য : ধান ও সেগুণ কাঠ।

পেনাং হইতে রেলপথে ব্যাঙ্ককে পৌঁছা যায়। এখানকার রাজপ্রাসাদ, রজত সিংহাসন, বৌদ্ধ-মন্দির ও মস্‌জিদ দেখার জিনিস।

চিঙ্গমাই। উত্তর-শ্যামের রাজধানী। ইহা শান ষ্টেট ও চীন-সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জন-সংখ্যা—৩৫,০০০ হাজার। একটী রেলপথ ব্যাঙ্কক হইতে আসিয়া এখানে শেষ হইয়াছে। দেশের চতুর্দ্দিক পাহাড়-ঘেরা বলিয়া ইহা স্বভাব-শোভার বিশিষ্ট কেন্দ্র। নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দেশের আবহাওয়া শীতল।

লোপবুরি। শ্যামজাতির দোল্‌না নামে অভিহিত। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর বহু ইমারত, প্রসিদ্ধ রাজা পাহরানাভাইসের দরবার হল, খামের মন্দির, ধ্বংসস্তূপ এবং ফারাপ্রাংসামইয়াটের বহু পুরাতন কীর্ত্তি এই রাজধানীতে আজিও বিদ্যমান। ব্যাঙ্কক হইতে রেলপথে সাড়ে চারি ঘণ্টার মধ্যে এইস্থানে পৌঁছা যায়।

নাকোনপ্যাটোম। এখানে একটী বিরাটকায় বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। ইহার উচ্চতা ৩৬০ ফিট। নাকোনস্মৃটামারাট টাংসং জংশনের দক্ষিণাপথের শাখা। ইহা প্রাচীন শহর। অতীতদিনের যুদ্ধ নিবারণী প্রাচীর ও কামান এখানকার শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য। নীরেট সোনার পাতে মোড়া একটী বুদ্ধমূর্ত্তি এখানে আছে। প্রধান প্রবেশদ্বারের বামের বুদ্ধমূর্ত্তির উচ্চতা ১৬´ ফিট। হাজার বছর আগে

ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্যামের স্থপতি-শিল্পের দিক দিয়া ইহা অতুলনীয়।

পেচাবুরি। চূণাপাথরের বহু পাহাড়িয়া গহ্বরের মধ্যে বিগ্রহ স্থাপিত। এখানকার বুদ্ধ-মূর্ত্তিও সুবর্ণমণ্ডিত।

সঙ্কলা অথবা সিঙ্গোরা। চীন-জলদস্যু কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। অতঃপর, মালয়গণ প্রাচীন সঙ্কলার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সিঙ্গোরা নামকরণ করেন। দক্ষিণ-প্রদেশের ভাইসরয় এখানে বাস করেন। শহরের অবস্থান মনোজ্ঞ।

মহাসাগরের দেশে

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহার মধ্যে হাওয়াই (Hawaii), মাওয়াই (Mauai), কাহুলাই (Kahoolawe), লানাই (Lanai), মোলোকাই (Molokai), ওয়াহু (Oahu), কাওয়াই (Kauai), সামোয়া (Samoa), ফিজি (Fiji) তাহিতী (Tahiti), টোঙ্গা (Tonga), মাকুইসস্, রারোটোঙ্গা (Rarotonga), পাগোপাগো (Pagopago), মুরিয়া (Moorea), ভাভো (Vavou) প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। জাপানের কোবে বন্দর হইতে জাহাজে এই সকল দ্বীপে পোঁছা যায়। প্রথমতঃ, আমরা হাওয়াই দ্বীপের কথা সঙ্ক্ষেপে বলিব।

এই দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের রঙ্‌বেরঙের মনোরম দৃশ্য দেখিতে যেরূপ আনন্দদায়ক, তেমন আর কিছুই নয়।
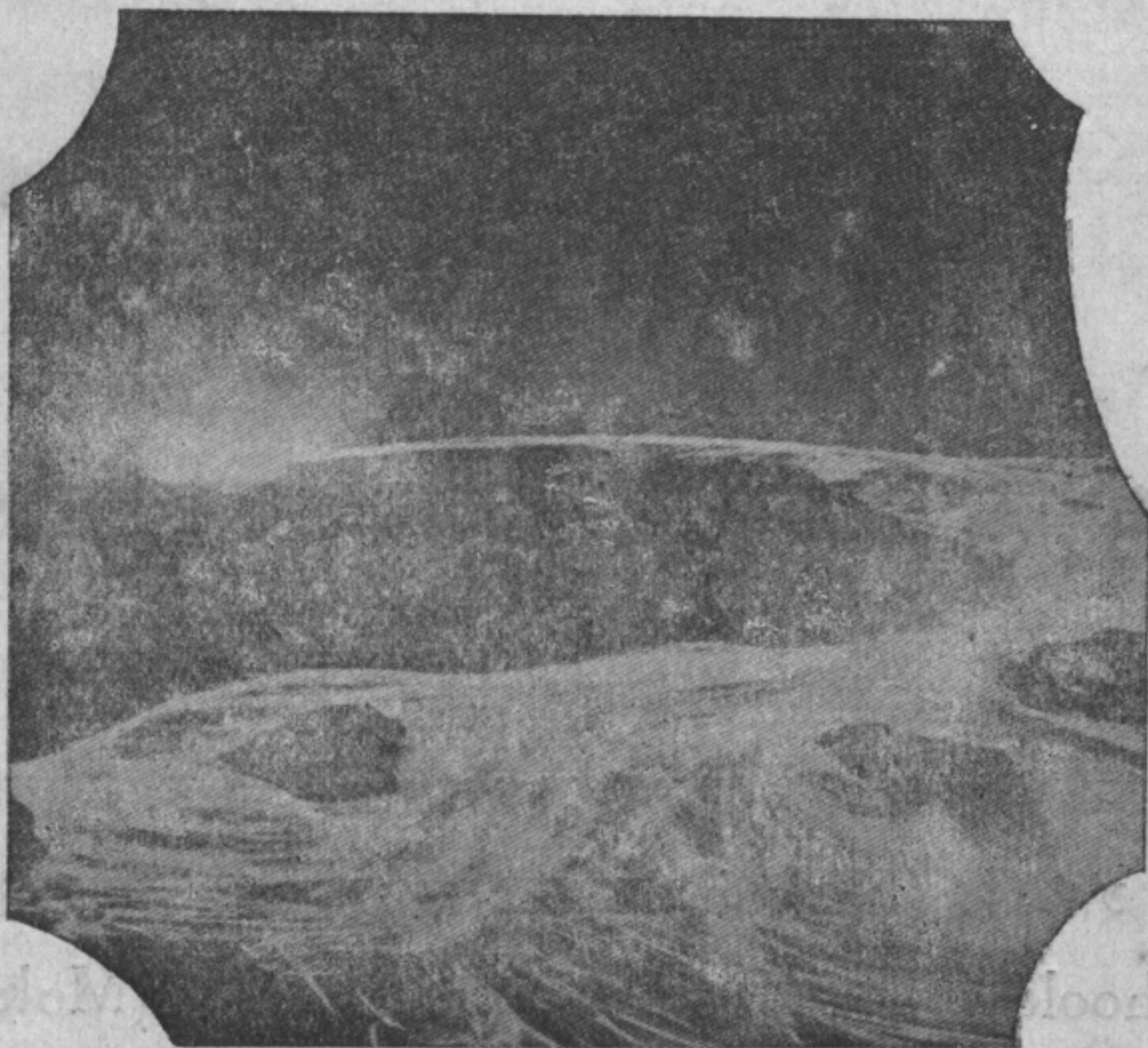
হাওয়াই ন্যাশনাল পার্কের অনল-প্রবাহ

দ্বীপগুলি হোনুলুলু হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত। পাহাড়ের উন্নত শিখর হইতে দেখিলে দিগন্ত-বিস্তৃত অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি নয়ন-মন মুগ্ধ করে। সাগরের কূলে নারিকেল, গুবাক, তাল প্রভৃতি নানারকম বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত বারিধির দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে,—গভীর ছায়াযুক্ত কুঞ্জবীথিময় উপত্যকাগুলি, পাহাড় হইতে নামিয়া আসা

অসংখ্য সরু সরু জলপ্রপাত, ইক্ষু ও আনারসের বিস্তীর্ণ ক্ষেতগুলির সৌন্দর্য্য বাস্তবিক অফুরন্ত। প্রতি দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের অতুলনীয় স্বভাব-সৌন্দর্য্য

ওয়াহু হইতে হিলোর পথ

বিরাজ করিতেছে। হিলোর পূর্ব্বদিকে হাওয়াই দ্বীপের উপর দিয়া একটী রাজপথ অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রতিদিন বহু লোক এই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে।

ইহার চারিদিকে চমকপ্রদ এম্ (Elm) বৃক্ষের সারি যেন নীল সাগরের দিকে মুখ ফিরাইয়া পাহাড়ের উপর দোল্ খাইতেছে। হোনুলুলু, এই দ্বীপসমূহের রাজধানী।

সুবিখ্যাত ডায়মণ্ড-হেড (Diamond-Head) ছাড়িয়া মনোমুগ্ধকর হ্যানাওমার পার্শ্ব দিয়া চলিবার সময় মোলোকাই দ্বীপের তটভূমি ক্রমশঃ চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিতে থাকে। মোলোকাই দ্বীপের কামাকাউ গিরিশ্রেণীর উচ্চচূড়া বহুদূরের দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দ্বীপের কোলো বন্দর, হেলেনা, কালোপাপা, হালাওয়া, কেপুহি প্রভৃতি স্থানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোলোকাই দ্বীপের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য এত চমকপ্রদ যে, দর্শকের চিত্ত নিমেষের জন্য যুগপৎ মুগ্ধ-আনন্দে ভরিয়া যায়। এখান হইতে একটী চ্যানেল পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে ক্রমে মাওয়াই দ্বীপে পৌঁছা যায়; দক্ষিণে লানাই দ্বীপ অবস্থিত। এইসব দ্বীপের উপত্যকা, ঝর্ণাধারা, ইক্ষু, কদলী ও আনারসের ক্ষেতগুলি দেখিতে ভারি চমৎকার। এখান হইতে গগন-চুম্বী হেলিকলা পর্ব্বতের ধূসর-ধূমময় দৃশ্য নয়ন সমক্ষে প্রকট হইয়া উঠে। এই হেলিকলা পর্ব্বতের চতুঃপার্শ্বে চিকাগো শহর বিস্তৃত। মোলোকাই দ্বীপ হইতে সমুদ্র পাড়ি দিয়া অন্য দ্বীপে যাইবার সময়

নীল-সাগরের তরঙ্গের খেলা দর্শকের মনে এক অভিনব বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্র মোলোকিনী ও কাহুলাওয়ী দ্বীপের দৃশ্য চোখের সুমুখ দিয়া বায়স্কোপের ছবির ন্যায় ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ক্রমে, সমুদ্র তীরবর্ত্তী উন্নত পাহাড়ের তুষার-মণ্ডিত শৃঙ্গ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ১৪,০০০´ হাজার ফিট। অতঃপর, যতই সৌন্দর্য্যভরা হিমাকয়া তীর অতিক্রম করিয়া চলা যায়, ততই বৃহৎ মউনিকিয়ার চতুর্দ্দিকস্থ নদী-মেখলা দ্বীপের অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী মূর্ত্ত হইয়া উঠে। ইহার সর্ব্বপ্রান্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রূপরাশির মধ্য দিয়া অগণিত নির্ঝরিণী নির্গত হইয়াছে। এখান হইতে কাওয়াই দ্বীপের দূরত্ব খুব বেশী নহে।

এই দ্বীপকে সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বা উদ্যান-দ্বীপ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। যে মুহূর্ত্তে হোনুলুলু ছাড়িয়া ওয়াহুর দিকে যাত্রা করা যায়—সেই মুহূর্ত্তে ছায়াযুক্ত উপত্যকা, সুদৃশ্য ধান্যক্ষেত্র এবং গভীর অরণ্যবেষ্টিত ওয়ায়েনি পর্ব্বতের নভঃস্পর্শী শৃঙ্গের মনোরম দৃশ্য দর্শককে মুগ্ধ-আনন্দে বিভোর করিয়া দেয়। ক্ষণেকের জন্য আপনার অতীত-বর্ত্তমানকে বিস্মৃত করিয়া ফেলে। একটু অগ্রসর হইলে

কাওয়াইয়ের সবুজ মাঠের গো-চারণভূমি, লতা-বিতানে ঢাকা হরিতক্ষেত্র চোখের সুমুখে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তথায় পৌঁছিবার আগে পর্ব্বত ও উপত্যকাগুলি দর্শকের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেগুলির দূরত্ব খুব নিকটে বোধ হইবার পূর্ব্বেই নীচে নামিবার আবশ্যক হয়। এই পর্য্যটন বহুদূরব্যাপী না হইলেও অতি উপভোগ্য এবং আরাম-দায়ক। এই দ্বীপগুলির মধ্যে অতিথিদের জন্য যেন একটী অভূতপূর্ব্ব আতিথেয়তাপূর্ণ জগত বিরাজ করিতেছে। এইসব দ্বীপের খণ্ডমেঘঢাকা আকাশ, স্নেহের পরশ-বুলানো বাতাস, দিগন্ত-বিস্তৃত মহাসাগর এবং দ্বীপবাসীর সরল-স্বাধীন বিচরণ যিনি অবলোকন করিয়াছেন, তিনি সত্যই ধন্য, তাঁহার জন্ম সার্থক, তিনি সৌভাগ্যবান! এই দ্বীপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি অবসর মত কোন এক সময় কাজে লাগাইতে সমর্থ হইবেন—তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

কাওয়াই, বৈচিত্র্য-মাধুরীতে ভরা—দ্বীপ-সৌন্দর্য্যের-রাণী! ভ্রমণকারিগণ ইহাকে স্বর্গ-রাজ্য বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার উর্ব্বর উপত্যকাসমূহ, উন্নত-শীর্ষ-পর্ব্বত-মালা, যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীভূত জলপ্রপাতের অনন্ত-অফুরন্ত প্রবাহ, সাগর-ঢেউয়ের প্রলয়-নাচন, সাগর-সৈকতে

সাময়িক ভীম প্রভঞ্জন, বজ্রের বিকট গর্জ্জন প্রভৃতি উন্মত্ত প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা দর্শকের চক্ষুকে ধাঁধাইয়া দেয়। আবার সুন্দর সুন্দর চারাগাছ,—ফুল ও ফলভারে নত, বৃক্ষে-জড়াইয়া-থাকা দ্রাক্ষালতা, সাদা বালু-বেলাভূমি

প্রবাল দ্বীপ-বাসীরা সমাধি প্রস্তর ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

পর্য্যটকের চিত্ত-মন বিমোহিত করিয়া দেয়। সাগর-কূলের অলস মৃদু ঢেউ, তরু-লতায় আবৃত কোমল ঘাসের গালিচা

ও ছায়াপূর্ণ-তালবৃক্ষশ্রেণী, শীতল-মধুর বায়ুর মায়া-পরশে বিচিত্র আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায় যে, দক্ষিণ দেশীয় সাগরের উপকূলে আমাদের যৌবনের কল্পনা ও সোনালি-স্বপন যদি কোন আদর্শ দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করিতে পারে—তাহা এই বাস্তব দ্বীপের অভাবনীয় সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। দেশবাসীর বৈশিষ্ট্যময় জীবন-যাত্রা প্রণালী, বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, অনিন্দ্যসুন্দর অফুরন্ত স্বভাবের দান, দর্শকের মানসপটে চিরদিন স্বর্গীয় সুষমায় ভরিয়া রাখিবে। মর্ত্ত্যের এই স্বর্গ-রাজ্যের কাহিনী প্রকৃতির সেরা-সৃষ্টি প্রশান্ত মহাসাগরের এইসব দ্বীপের কথা অনন্তকাল ধরিয়া ধরণীর ইতিহাসে অতি সযতনে সঞ্চিত থাকিবে। এইসব দ্বীপ সম্বন্ধে মিঃ এডওয়ার্ড গ্রে লিখিয়াছেন ঃ

"The Land of everlasting summer, flaming sunsets of Seas and jade—is this elusive far away country to be sighted for, but never seen ? Who has not sensed the lure of distant shore and palm fringed beach, where out-door life is continuously the order of the day ? Where lives the soul that has not longed

for that mysterious some place where the moon peeps out at night through the cocoa

প্রবাল দ্বীপবাসীদের নাসিকার অলঙ্কার।

palms and the native boys stroll the coral sands'neath the Southern eross, their music echoing the swish of the waves."

ওয়াহুর পশ্চিমে হোনুলুলু হইতে ৯০ মাইল দূরে কাওয়াই দ্বীপ অবস্থিত। প্রত্যেক সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার ৯টার সময় একখানা সুশোভিত ষ্টিমার হোনুলুলু হইতে ছাড়িয়া পরদিন প্রত্যূষে কাওয়াই দ্বীপের নওয়ালিলি বন্দরে পৌঁছে। এই ষ্টিমার প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার রাত্রি ৯টার সময় কাওয়াই হইতে ছাড়িয়া পরদিন প্রাতে ৬॥টায় হোনুলুলু ফিরিয়া আসে। বিনা আয়াসে ও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে দ্বীপের অফুরন্ত প্রাকৃতিক শোভা দেখিবার সুযোগ-সুবিধার জন্য দর্শক-দের সুবিধা আছে। লিহিউ হোটেল হইতে প্রাতঃরাশ শেষ করিয়া দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে যাইয়া ভ্রমণ আরম্ভ করা সমধিক সুবিধাজনক। টাকা খরচ করিতে পারিলে প্রাইভেট মোটরগাড়ীও পাওয়া যায়। মোটরযোগে, আনারস ও ইক্ষুক্ষেত ভেদ করিয়া কোলাওয়া যাওয়া যায়। এইখানেই প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ হেইয়াও (Heiau) মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্য-মান। হাওয়াইজিয়ান প্রতিনিধি যুবরাজ কুহিও এইখানেই জন্মগ্রহণ করেন। ধ্বংসাবশেষের ছবি দর্শকের অন্তর-মাঝে একটা করুণ অনুভূতি জাগাইয়া দেয়।

ওয়াহু

হেইয়াও ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে স্পোর্টিংহর্ণ অতিক্রম করিতে হয়; তাহার পরেই লাওয়াই পৌঁছা যায়। এইস্থানে অতীতদিনে রাণী এমার প্রাসাদ

সন্তান, পিতার নাসিকা ছিদ্র করিতেছে।

ছিল। এখন ইহা জনৈক ধনিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এইস্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা নয়নাভিরাম।

বেলাভূমির কিনারায় উন্নতশীর্ষ তালবৃক্ষ দণ্ডায়মান,—দেশীয় আঙুর ও ফুলের গাছগুলি এমন অভিনব রঙ ধারণ করিয়াছে যে, আমাদের বর্ণনাশক্তিকেও হার মানাইয়া দেয়। লাওয়াই হইতে রওয়ানা দিয়া কুকইলোন্না পার্কের দিক যাওয়া সুবিধাজনক। কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেক পর্য্যটক এই উদ্যানটী ভাল করিয়া দেখিয়া ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। উদ্যান দেখা শেষ করিয়া হেনাপেপ্ (Henapepe) উপত্যকা অতিক্রম করিয়া কয়েক মাইল অগ্রসর হওয়ার পর ওয়েমিয়া পল্লীতে উপস্থিত হওয়া যায়। এই দ্বীপগুলির আবিষ্কারক ক্যাপ্টেন কুক ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জানুয়ারী, এই গ্রামে প্রথম অবতরণ করেন। ইক্ষুচাষের কেন্দ্রস্থল কেকাহা (Kekaha) পার হইয়া কিছুদূর গেলে রাস্তা হঠাৎ দক্ষিণে বাঁকিয়া—ক্রমে ক্রমে ক্ষেতের ভিতর দিয়া পুকাপেল (Pukapele) পর্য্যন্ত গিয়াছে। ওয়েমিয়া হইতে পুকাপেলের উচ্চতা ৩,৬৫৭´ ফিট।

এইস্থান হইতে ক্যানিয়নের অতুল্যরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। ফিরিবার পথে কুকুরের ন্যায় শব্দকারী বালুকা (Barkig Sand) স্তূপ দেখা যায়। সাদা সাদা বালুকার চাকতি যখন উচ্চ হইতে নীচে সশব্দে পতিত

হয়, তখন, কুকুরের ডাকের মত শব্দ হয়। এই দ্বীপের পূর্ব্ব ও উত্তর উপকূলে সুদর্শন উপসাগর ও বেলাভূমি বিস্তৃত আছে। তাহা দেখিয়া হানালি (Hanalei) উপত্যকায় যাওয়া সঙ্গত। এই উপত্যকা শিল্পীদের অতি আদরের স্থান। ইহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য তাঁহাদের মনে বিপুল আনন্দের সঞ্চার করিরা দেয়। রাস্তার শেষ-প্রান্তে হেনাগুহা (Haena Cave) অবস্থিত। এখান হইতে একটি সরু পার্ব্বত্যপথ শিখরদেশে গিয়া মিশিয়াছে। এখান হইতে হানালি উপসাগরে অবগাহনের দৃশ্য অতীব চিত্তাকর্ষক। বহু নর-নারী উপসাগরের স্বচ্ছ-নির্ম্মল জলে স্নান করে; সন্তরণপটু বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতী, সকলে এক সঙ্গে স্বাধীনভাবে স্নান করে,—তরঙ্গের উপর দিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, তরঙ্গের আঘাত খাইয়া তরঙ্গেরই সাথে ক্রীড়া করে। ইহাদের জল-কেলীতে দোষ নাই, কামনা নাই, আবিলতা নাই—ইহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। অবগাহন সমাপনান্তে সকলে তটভূমিতে উঠিয়া স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান করিয়া পরম স্ফূর্ত্তির সঙ্গে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই স্নান প্রত্যেক দর্শকেরই লোভনীয়।—ইহা এমনি শিশু-সুলভ ও প্রীতিদায়ক। এখান হইতে জাহাজে মাওয়াই দ্বীপ হইয়া হাওয়াই

দ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করা সঙ্গত এবং তথাকার দৃশ্যগুলি দেখিয়া প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ (Coral Islands)-এর উদ্দেশে যাত্রা করা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। মাওয়াই দ্বীপের ওয়ালিয়া প্রপাত, ওয়েলিয়া প্রস্রবণ, কিয়ানি উপত্যকা প্রভৃতি দর্শনযোগ্য এবং হাওয়াই দ্বীপের হিলো শহর, নারিকেল বন, ন্যাশনাল পার্ক, উইয়ে কাহুনা ব্লাক,
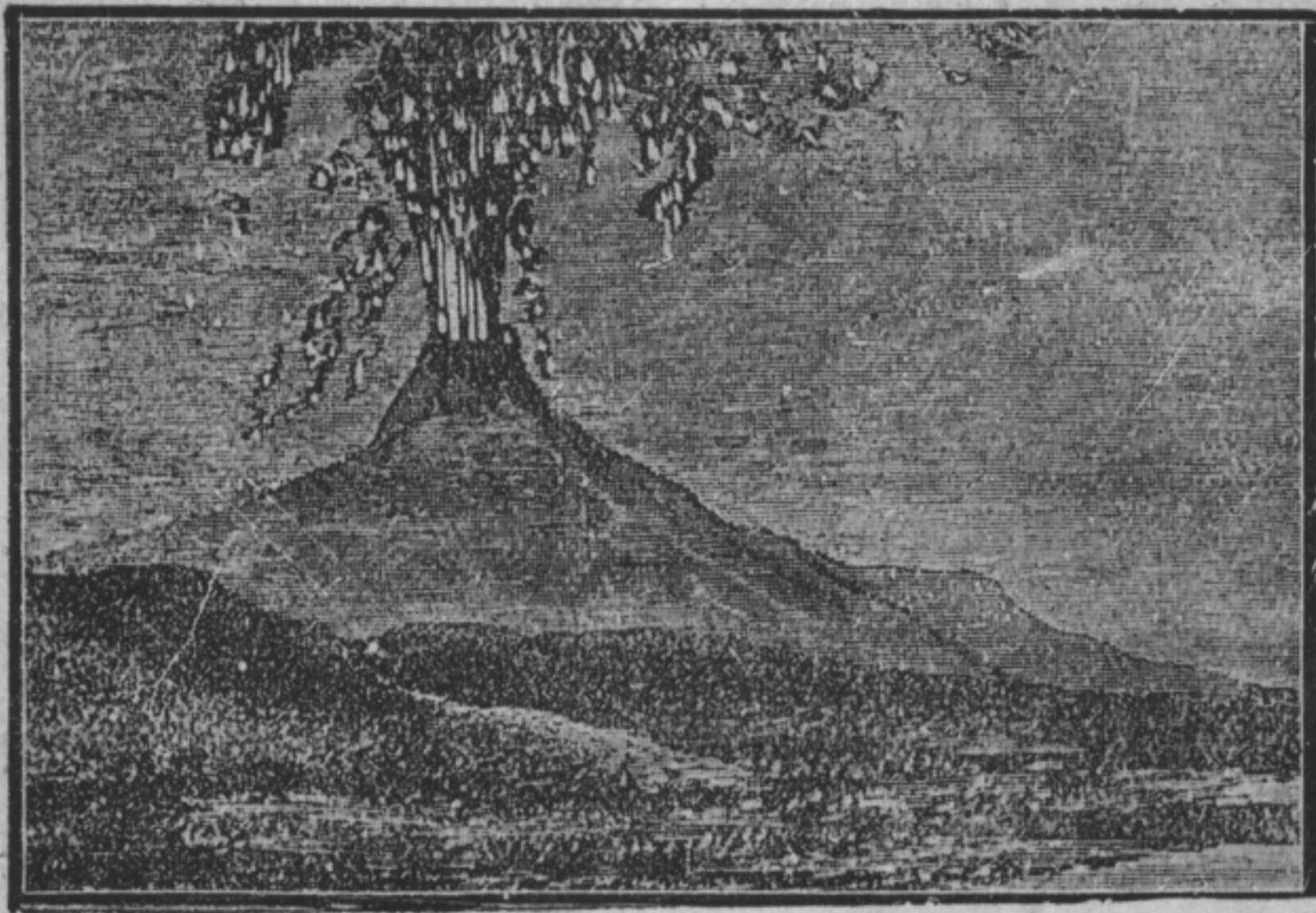
কেলাওয়া আগ্নেয়গিরি

টুইন ক্রেটার্স, কেলাওয়া আগ্নেয়গিরি, হানাউনা প্রাচীন শহর, আলিকা ফ্লো (Aleika flow), হুপুলোয়া ফ্লো, লাভা টিউব, বৌদ্ধ ও চিনা মন্দির প্রভৃতি বিস্ময়কর এবং দর্শনীয়। এতদ্ব্যতীত, হাওয়াই দ্বীপের কাউ রক্ষিত-

বনভূমি, দিগন্ত-প্রসারী মরুভূমি প্রভৃতিও দেখিবার মত।

প্রবাল-দ্বীপের সর্ব্বত্র হাজার হাজার নারিকেল, তাল ও কদলী বৃক্ষ বিদ্যমান। নারিকেলগুলি খুব বড় হয়, তবে, তাহার স্বাদ খুব ভাল নহে। এখানকার নারিকেল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান হইয়া থাকে। নারিকেলের শাঁস পিষিয়া নির্য্যাস বাহির করিয়া তদ্দ্বারা সাবান প্রস্তুত করা হয়। নারিকেলের মালা কাটিয়া-ছাটিয়া সুন্দর সুন্দর বোতাম প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যদেশের সৌখিন বাবুরা তাহা বিশেষ আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রবাল দ্বীপবাসীরা যথেষ্ট লাভবান হয়।

প্রবাল দ্বীপ

দ্বীপবাসীরা নিরীহ, ভদ্র ও বেশ সদালাপী। ইহারা কর্ম্মক্ষম, সহিষ্ণু ও প্রিয়দর্শন। ইহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা প্রণালী খুব সহজ ও অনাড়ম্বর। ইহারা সাধারণতঃ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করে। কুড়ি বৎসরের যুবক, ১৬ বৎসরের তরুণীকে বিবাহ করিয়া থাকে। যুবক-যুবতীর বিবাহের বয়সের মধ্যে চারি বৎসরের ব্যবধানই ইহারা সামাজিক রীতি অনুসারে যথেষ্ট বলিয়া মনে করে।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা সামান্য একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা নিম্ন অঙ্গ ঢাকিয়া রাখে। চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণীরা অধিকাংশ সময় শরীরে কোনরূপ আবরণ রাখে না— ইহাই এদেশের প্রথা! ইহাতে ইহাদের লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই ও দ্বিধা নাই। নারীরা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য প্রত্যেকে উল্কি ধারণ করিয়া থাকে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে তাহা রঙ-বেরঙে বিচিত্রিত হয়। কুমারী তরুণীদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে মৎস্য-চিত্র ও জ্যামিতিক রেখা-চিত্র অঙ্কিত হইতে দেখা যায়।

দ্বীপের মধ্যে ম্যালো নামক একটী উন্মুক্ত স্থান দেখা যায়। ইহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। দ্বীপ-বাসীরা এখানে মনের আনন্দে নাচ-গান প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে পল্লী প্রান্তস্থিত কূপ হইতে জল তুলিয়া পান করে। ইহারা ফলমূল এবং কাঁচা মৎস্য সূর্য্যপক্ক করিয়া ভক্ষণ করে।

ক্ষয়রোগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব এই দ্বীপে যথেষ্ট; শুধু ম্যালেরিয়া নাই। গত ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপের জনসংখ্যা ছিল—৫,০০০ হাজার। বর্ত্তমানে ৭৫০ জনে নামিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া বহু লোক মারা গিয়াছে।

দ্বীপবাসীরা মৎস্য-শিকারে খুব পটু। ইহারা কাঠ দিয়া ডোঙ্গা প্রস্তুত করে এবং পাথর দিয়া অস্ত্র তৈয়ার করিয়া মৎস্য ও হাঙ্গর শিকারে বহির্গত হয়। ডোঙ্গা

প্রবাল দ্বীপবাসীদের কাঁচা মাছ ভক্ষণ

ভাসাইয়া ইহারা সাগরবক্ষে বহুদূরে যায়—অনেক সময় যাত্রীও লইয়া থাকে। যে-সমস্ত হাঙ্গর, মৎস্য ও কচ্ছপ

ইহারা শিকার করে, তাহা অগ্নি-ঝল্‌সা করিয়া আহার করে।

ইহাদের প্রধান ফসল—নারিকেল, কদলী ও পিঠে ফল। নারিকেলের সমস্ত জিনিস ইহারা কাজে লাগায়। পত্র দ্বারা পাটি, ছোব্‌ড়া হইতে দড়ি, মালা দিয়া জলের পাত্র, ঝাটার শলাকা, অঙ্গাভরণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। মেয়েরা বাগান পাহারা দেয়, যাহাতে কোন ফল চুরি না যায়, অথবা ইঁদুরে নষ্ট করিতে না পারে।

প্রবাল দ্বীপ হইতে দূরে এবং নিকটে আরো কয়েকটী দ্বীপ আছে। প্রথমে লিউয়ানিয়া ও কেইলার কথা বলা যাক্। ইহাদের অধিবাসীদেরও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা উপরোক্ত ধরণের। গ্রামের মাতব্বর শাসন-কার্য্য চালাইয়া থাকেন। লিউয়ানিয়ার বর্ত্তমান রাজার নাম—মেকাইকি। কেইলায় তালগাছের সংখ্যা খুব বেশী। তালও খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হয়। এই দ্বীপের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র জনপদ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় ১৮৭০ সালে এর অধিবাসীরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করে। নিহত যোদ্ধাদের স্মৃতি-স্তম্ভ আজিও দ্বীপে বর্ত্তমান থাকিয়া, ইহার অতীত ইতিহাস দর্শককে স্মরণ করাইয়া দেয়। কোন বিশেষ

লিউয়ানিয়া ও কেইলা

স্মরণীয় উৎসব-দিনে এইসব স্মৃতি-সমাধি নারিকেল পত্র দ্বারা সাজানো হয়। এই দ্বীপে পাঁচটী কবরস্থান আছে এবং এখানকার পাথর কোমল বলিয়া এইসব পাথর সমাধির গাত্রে লাগে না। অন্যস্থান হইতে কঠিন পাষাণ আনিয়া, তাহাতে হাঙ্গর, কচ্ছপ প্রভৃতির চিত্র খোদাই করিয়া ব্যবহার করা হয়। ইহারা সমাধি-ক্ষেত্র খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। কেলুয়াকিন্তি নামক এক দ্বীপবাসিনী এখানে উপনিবেশন স্থাপন করেন। তিনি ইহার নাম দেন—লিউয়ানিয়া বা নয়ানিউয়া। আবিষ্কারের সময় ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে বেশী উচ্চ ছিল না। এই দ্বীপের বিস্তার কয়েকশত গজের অধিক নহে।

এই দ্বীপে পেলাও নামে আর একটী সম্প্রদায় আছে। ইহাদের সংখ্যা মাত্র দেড়শত। ইহারা পার্শ্ববর্ত্তী ছোট একটী দ্বীপে বাস করে—এই দ্বীপও পেলাও নামে কথিত হয়। এখানে মশার দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশী। এখানকার নারী-পুরুষেরা সাগর-বক্ষে নৌ-বিহার করে—ডোঙ্গায় পাল খাটাইয়া মনের আনন্দে বাইচ্ খেলে এবং সাগর-মাঝে ঘুমাইয়া মশকের দংশন হইতে আপনাকে রক্ষা করে। উৎসবাদিতে তরুণীরা অনাবৃত দেহে নৃত্য করে, লতাপাতার অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া স্বদেশী গান গায়। পুরুষরাও

সে উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহের সময় কন্যাপক্ষকে ঝুড়ি ঝুড়ি শুট্‌কি-মাছ এবং হাজার

পাপিতীর নর ও নারী ভেনিলা কুড়াইতেছে

কয়েক নারিকেল দিতে হয়। সেগুলি বরপক্ষের প্রদত্ত যৌতুক বলিয়া গৃহীত হয়। বিবাহের পর স্ত্রী, স্বামীকে

আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দেয় এবং অধিক সময় স্বামীগৃহে থাকে। স্বামী-গৃহে বাসকালীন নব-বধু কচ্ছপের খোলার অলঙ্কার ও পত্র নির্ম্মিত কঙ্কণ ব্যবহার করিয়া থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে মাতা তাহাকে গরম জলে স্নান করায় এবং সূতা মন্ত্রপূত করিয়া শিশুর কোমরে বাঁধিয়া তাহাকে ভূত-যোনীর দুষ্ট প্রভাব হইতে রক্ষা করে।

তাহিতী

প্রবাল দ্বীপ হইতে তাহিতী (Tahiti) যাওয়াই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। কয়েকদিন সমুদ্রবাসের পর দূর হইতে যখন তাহিতী দ্বীপের অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গগুলি দৃষ্টিগোচর হয়, তখন মনে হয়—সেগুলি যেন উত্তাল-তরঙ্গময় নীল-সাগরের বুক চিরিয়া অনন্তকালের জন্য শির উন্নত করিয়া রহিয়াছে। ক্রমে, জাহাজ পাপিতীর ছায়াকুঞ্জময় পোতাশ্রয়ে নোঙ্গর করে। পাপিতী, পলিনেশিয়ার বিক্ষিপ্ত ফরাসী অধিকারের রাজধানী। মনে হয়, যেন ইহা নিখিল-বিশ্বের প্রেম-বিলাসের কেন্দ্রভূমি—এখানে ৫,০০০ হাজার লোক বাস করে। একজন পর্য্যটক লিখিয়াছেন : "Anyone wanting to observe or take part in the life of the polynesian natives, will probably have

a better opportunity in 'Tahiti' than any of the other South-sea Islands."

তাহিতীর কিশোর-কিশোরী

সমুদ্র-বক্ষ হইতে ইহাকে বেগুনে রঙের ঘন-বনানীর মধ্যে অর্দ্ধাবৃত অবগুণ্ঠনবতী কুমারীর মুখচন্দ্রিকার ন্যায় দেখায়। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সৌধ-কিরীটিনীর সোনালী-

ছাদ যেন আলেখ্যর মত ভাসিয়া উঠে। স্বদেশী-শিল্পে বন্দরখানা ভরিয়া নানাবর্ণের ফুল-ফল যেন জাহাজকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে থাকে।

পাপিতী হইতে ষ্টিমারে ঘুরিয়া আরো কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে যাওয়া যায়। এখানে ভাড়াটিয়া মোটরগাড়ীও পাওয়া যায়। মোটরে ব্রুম রোড (Broom Road) ধরিয়া অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বীপের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি ঘুরিয়া আসা যায়। সাগর-কূলের রাস্তা ধরিয়া টাইয়ারাপু (Tiarapu) স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া আসা যায়। এই ভ্রমণ বেশ আরাম-প্রদ। যাঁহারা মোটরের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক, তাঁহারা সাইকেল ভাড়া করিয়া সর্পের মত আঁকাবাঁকা (zigzag) পার্ব্বত্য পথে ঘুরিয়া আসিতে পারেন। এইজন্য এখানে কোনরূপ শুল্ক (Duty) দিতে হয় না। পাপিতী, প্রশান্ত-মহাসাগরের কতিপয় বিশিষ্ট পোতাশ্রয়ের রাজধানী। ব্রিটিশ এবং আমেরিকার কন্সাল (Consul) এখানে বাস করেন। সমগ্র শহর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত। এখানে তাড়িত বার্ত্তা, (Telegram), সামুদ্রিকবার্ত্তা (Cablegram) এবং বেতারবার্ত্তা (Wireless)-এর সুব্যবস্থা আছে। পাপিতী

পাপিতী

হইতে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত না হইলেও প্রত্যহ ডাকঘরে গিয়া জগতের সংবাদ বেতারে শুনিয়া আসা যায়। সরকারী হাসপাতাল, কতিপয় দন্ত-চিকিৎসক, রাসায়নবিদ্, চক্ষু-পরীক্ষক, বিপণী, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি থাকায় প্রবাসী পর্য্যটকদের কোনরূপ অসুবিধায় পড়িবার সম্ভাবনা নাই। জিনিস-পত্রাদি অন্যদেশের তুলনায় এখানে অপেক্ষাকৃত কম খরচে ক্রয় করা যায়। আমেরিকা ও ফরাসীদের দুইটী সিনেমা-ভবন এবং একটী সুরম্য ক্লাব এখানে বিদ্যমান।

পাপিতীর বাজারে হরেকরকম জিনিস স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখা যায়। শুশুক মাছ, উড়ুক্কু মাছ, অক্টোপাস্, কাঁকড়া আকারের সামুদ্রিক বিভিন্ন জীব-জন্তু এবং কদলী, পিঠেফল, আম, লেবু, তেঁতুল প্রভৃতিও এই বাজারে পাওয়া যায়। ঈদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক মৎস্যের বাজার ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না। ক্রেতা-বিক্রেতা সরল প্রাণে হাসিতেছে, গুঞ্জন করিতেছে ও তাহিতী ভাষায় খোশ-গল্প করিতেছে—তাহা দর্শনে ইহাদের বিলাস-বাসনা-হীন সহজ জীবন-যাপনের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাপিতী হইতে ভেনিলা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ভেনাস্ শৃঙ্গে পৌঁছা যায়। মধ্যপথে পোমেয়ারে তাহিতীর

শেষ রাজার স্মৃতি-স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার সন্নিকটে সাগর-সৈকতে স্নানের বন্দোবস্ত আছে এবং আট মাইল দূরে মাটাভাই উপসাগরে ক্যাপ্টেন কুকের নোঙ্গরের স্মৃতি-চিহ্ন বর্ত্তমান। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কুক সর্ব্বপ্রথম এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তিনি অতঃপর ভেনাস পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ইহার দিগন্ত-প্রসারী সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া আত্মহারা হইয়া যান। এইস্থান হইতে সাগর-বক্ষে সাব-ধানী আলোকস্তম্ভ, দীর্ঘ নারিকেল-বৃক্ষ, ভেনিলা ক্ষেত্র, কদলী-ঝাড়, সারি সারি বিটপীশ্রেণী ও তমালবৃক্ষবেষ্টিত পল্লীভূমি দূর-বিদেশী পর্য্যটকের মন আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া দেয়।

তাহিতীর পাদদেশ হইতে শৃঙ্গমালার শিখর পর্য্যন্ত ঘন-উজ্জ্বল ট্রপিক্যাল পুষ্প দ্বারা সুশোভিত। ইহাদের কয়েকটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭,০০০ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ। রঙিন-চিত্রের ন্যায় গ্রামগুলি যেন দ্বীপের ললাটে একটী তিলক বিন্দু। অধিবাসীরা সর্ব্বদা পরস্পর বন্ধু-ভাবাপন্ন এবং মিষ্টভাষী। তাহাদের কর্ম্মময় জীবন কোন-না-কোন কাজে লিপ্ত। বহুসংখ্যক জীবন্ত অগ্নিগিরি, বড় বড় নদী এবং ক্ষরধারা প্রস্রবণ ইহাদের মধুর জীবনকেও অনাগত দিনের ধ্বংসলীলার ভয়ে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে।

পাপিতী হইতে ৩৫ মাইল দূরে পাপেনু, মাহেলা ও হিতিয়া অবস্থিত। ইহার পরের স্থানগুলি দুর্ভেদ্য ও দুর্গম ; তবে, রাস্তা ঘুরিয়া ভাহিরিয়া হ্রদ, পাপেয়ারি, মাটাইয়া, মাহাইতিয়া, পাপেরা, পাইয়া, পুনাভিয়া, ফা প্রভৃতি নগর প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় পাপিতী বন্দরে পৌঁছা যায়। পুনাভিয়া দুর্গের ধ্বংস-স্তূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী এবং তাহিতীদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহারই স্মৃতি-চিহ্ন। ইহা দর্শনে পর্য্যটকের মনের উপর এদেশের অতীত ইতিহাসের একটা সুস্পষ্ট দাগ কাটিয়া যায়। ইহার কিছু দূরে পাপেরা নগর অবস্থিত। শতবর্ষ পূর্ব্বে ইহা তাহিতী দ্বীপের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। পাপেরা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ভিন্ন ধরণের। সোজা বংশদণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত শ্বেতবর্ণের টাউন হল—এখানকার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অন্যতম কীর্ত্তি। এই জায়গার অনতিদূরে মাহাইতিয়ারমারাই বিরাজমান। পূরাকালে পাপেরার প্রধানা শাসন-কর্ত্রী ওবেরিয়া কর্ত্তৃক ইহা প্রস্তুত হয়। এ-সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন কুক লিখিয়াছেন : "The Marai consisted of an enormous pile of stone-work, raised in the form of a pyramid with flight of steps on each side, and was nearly two

hundred and seventy feet long, about one third as wide and between forty and fifty feet high." অন্য একটী মারাই, পাপেরা হইতে এক মাইল দূরে, পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ উপত্যকার উপর বিদ্যমান।

পাপিতী হইতে মাটাইয়ার দূরত্ব মাত্র ২৭½ মাইল। এইস্থান এমনি রমণীয় যে, কথিত আছে—রুপার্ট ব্রুক (Rupert Bruke) এখানে মাসাধিককাল থাকিয়া তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'দি গ্রেট লভার' লিখিয়াছিলেন। এখান হইতে অনতিদূরে ভাইহিরিয়া পার্ব্বতীয় হ্রদ এবং তারাভাও যোজক অবস্থিত। এই যোজক এক মাইল দীর্ঘ, অন্যূন ৫০´ ফিট উচ্চ ; এবং এইখানেই একটি ফরাসী দুর্গ বিদ্যমান। এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিলে টাইয়ারাপু উপস্থিত হওয়া যায়। এখানে এত বড় বড় চেষ্টনাট বৃক্ষ আছে যে, তাহাদের বয়স নির্ণয় করা দর্শক এমন কি, উদ্ভিদতত্ত্ববিদের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন। এখান হইতে দূরের আবছা বনানী, শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল বৃক্ষের সারি, সাগর-বক্ষে ঝুঁকিয়া পড়া চক্রবাল, সত্যই চমক লাগাইয়া দেয়। তোওতিরা উপসাগরকেই কুক-এর নঙ্গরখানা বলা হয়। জন-বহুল না হইলেও

প্যাপিতীর পরেই সমগ্র তাহিতী দ্বীপের মধ্যে ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ। মিঃ রবার্ট লুইস এইস্থান সম্বন্ধে বলেনঃ
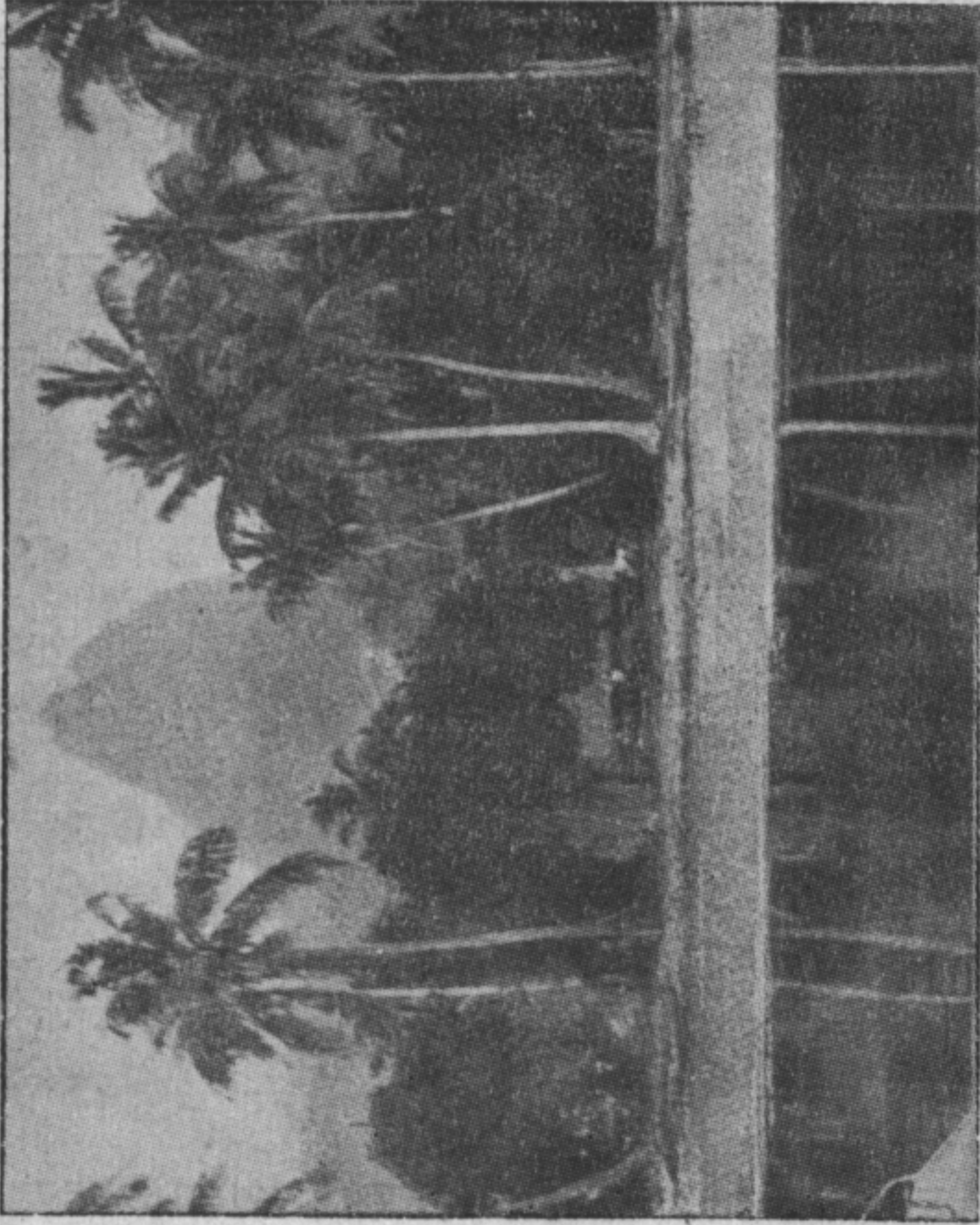
তাহিতীর সাগরকূলের দৃশ্য

"The most beautiful spot and its people the most amiable I had ever encountered." এখানে তিনি স্ত্রীসহ একমাস অবস্থিতি করিয়া "দি মাষ্টার-অব-ব্যালানট্রে" নামক পুস্তকের শ্রেষ্ঠাংশ লিখিয়াছিলেন।

আমেরিকার লেখক লুই-আর-ফ্রিম্যান এ-জায়গা সম্বন্ধে বলেন : "Is as lovely as a steamship company folder description."

তাহিতী দ্বীপের পরিমাণ-ফল—৪০০ শত বর্গ মাইল ও বালু-সৈকত ১২০ মাইল দীর্ঘ। এই দ্বীপের ওরোহেনা পর্ব্বত সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৭,৩২১´ ফিট উচ্চ—দক্ষিণ মহা-সাগরে এই পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম। লোক-সংখ্যা—১২,৫০০ হাজার, তন্মধ্যে, চীনাদের সংখ্যাই অধিক। তাহিতীবাসীদের অনেকে দেশীয় ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারে। এই দ্বীপের আকার কতকটা বাঙ্গলা ৪ সংখ্যার মত। পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজসকল এই দ্বীপে আসিয়া থাকে। এই দ্বীপের আব-হাওয়া খুব ভাল; দিনে ঈষদুষ্ণ, রাত্রে ঠাণ্ডা। সমুদ্র ও পাহাড় হইতে ঝির ঝির করিয়া সমীরণ বহিয়া আসিয়া নর-নারীর মনে-প্রাণে পুলক-শিহরণ জাগাইয়া দেয়। সারা বৎসরে গড়-পড়তায় দিনের বেলায় স্বাভাবিক তাপ-শৈত্যের পরিমাণ ৮৫° ডিগ্রী এবং রাত্রিবেলায় ৮৩° ডিগ্রী। কখনো কখনো নামিয়া ৬০° ডিগ্রীতেও পৌঁছিয়া থাকে।

দেশবাসী কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী নির্ব্বিশেষে ফুল অত্যন্ত ভালবাসে। কোন বিশেষ উৎসবাদিতে

ফুলের মালা ব্যবহার করে ও মাথায় লতাপাতার মুকুট ধারণ করে। খাদ্যের উপর পাতার আবরণ দিয়া অতিথিদের সাম্‌নে হাজির করে এবং পাতা সরাইয়া আহার্য্য পরিবেশন করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একাধিকবার কোন পত্র ব্যবহার করে না।

তাহিতীবাসীরা হুলাহুলা নৃত্য এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গীত-বাদ্য এখনো আদিম প্রথায়ও খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহা দর্শনে পাশ্চাত্য সভ্যদের মনের উপর বেশ স্থায়ী রেখাপাত হইয়া যায়।

এখানে রঙ্‌বেরঙের পাখী দেখা যায়। তাহারা মনের আনন্দে পাহাড় হইতে পাহাড়ে, বন হইতে বনান্তরে উড়িয়া বেড়ায়।—কুঞ্জবনে দল বাঁধিয়া গান করে এবং উপত্যকার গাছের শাখায় বাসা গড়িয়া ডিম পাড়ে। এখানে সর্প না থাকায় এই স্বর্গ-পক্ষীরা (Paradise birds) নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারে।

এই দ্বীপ সম্বন্ধে মিঃ ফ্রেডেরিক ও'ব্রিয়েন (Mr. Frederick O'Brien) লিখিয়াছেন : "There were trees, bushes and plants of yellow and white coral of scarlet corallins, dahlias and roses, cabbages and cauliflowers situated

perfectly, lilies and heaps of precious stones. On flat tables were starfish lazying at full width, strewn shells and hermit-crabs entering and leaving their captured homes. Mouve and primrose, pink and blue, green and brown, the coral plants nodded in the glittering light that filtered through the translucent brine."

তাহিতী-দর্শন সমাপ্ত করিয়া মুরিয়া (Moorea) দ্বীপে যাওয়াই সঙ্গত। তাহিতী হইতে ইহার দূরত্ব খুব অধিক নহে। অনেক পর্য্যটক উপেক্ষা করিয়া এই ক্ষুদ্র দ্বীপে আসেন না বটে, কিন্তু, এখানেও দেখিবার, উপলব্ধি করিবার এবং আহরণ করিবার অনেক কিছু আছে। আমরা খুব সঙ্ক্ষেপে এই দ্বীপের বর্ণনা করিব।

প্রশান্ত-মহাসাগরের বুকে যতগুলি দ্বীপ আছে, ততগুলি অন্য কোন সাগরে আছে কিনা জানিনা। তবে, প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপগুলি যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার, একথা প্রত্যেক দর্শক স্বীকার করেন।

অনন্ত বারিধির মাঝে মুরিয়া দ্বীপে বহু-সংখ্যক অগ্নিগিরির উন্নতশীর্ষ শৃঙ্গ—খণ্ড দ্বীপের স্বভাব-সুলভ চপলতায় পূর্ণ—সুন্দরী তরুণীদের অবাধ গতিবিধি প্রবাসী ভ্রমণকারীর মন-প্রাণ আনন্দরসে ভরিয়া যায়। মুরিয়া দ্বীপের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর, এখানে অল্প পরিশ্রমে প্রয়োজনের অধিক শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি সম্যক বর্ণনা করিতে পারিতেন—হয়তো মহাকবি কিট্‌স্ (Kets) ; কারণ, পিয়েরলোতি (Pierreloti) এই সাগর-ভূমির রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া আংশিক সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু, ষ্টিভেন্‌সন ব্যর্থ হন। অন্যান্য দুই একজন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের লেখকও পণ্ডশ্রম করেন। আমাদের মনে হয়, কলমের মুখে এই মানস-কুঞ্জের রূপ যতটা ফুটিবে, তাহার চাইতে বেশী ফুটিবে, ক্যামেরা-প্লেটে। এই সাগর-দেশের অফুরন্ত শোভা বোঝা যায়, কিন্তু, বোঝানো শক্ত।—ইহা এমনি অভূতপূর্ব্ব !

মুরিয়া

পাপিতী হইতে মুরিয়ার দূরত্ব মাত্র দশ মাইল। কিন্তু, পাপিতোয়াই (Papetoai) উপসাগর এবং শহর, দ্বীপের অন্য সীমান্তে অবস্থিত। ইহারই

একপার্শ্বে আফারিতু (Afareaitu) নামক হোটেল বর্ত্তমান।

রারোটোঙ্গা দ্বীপের দৃশ্য

একখানা যাত্রীবাহী মোটর-বোট সপ্তাহে দুইদিন তাহিতী ও মুরিয়ার মধ্যে যাতায়াত করে। হোটেল-কর্ত্তৃপক্ষ দর্শকদের জন্য আলাদা আলাদা মোটর-বোটের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। দক্ষিণ মহাসমুদ্রের মুরিয়া, ধরণীর মাঝে যেন স্বর্গপুরী। এখানে কোন মোটর গাড়ী না থাকায় দর্শকেরা অশ্বারোহণে, অথবা পদব্রজে মুরিয়া ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া থাকেন। এই দ্বীপের পরিধি ৩৫ মাইল। সাইকেলে একদিনেই প্রদক্ষিণ করা সম্ভব। গ্রামের মধ্যে যে-সকল হোটেল আছে, তথায় আহার-বাসস্থানের সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

মুরিয়া দ্বীপ অলস-অবকাশ-দিন-যাপনের উৎকৃষ্ট স্থান। পার্ব্বত্য-পথে অশ্বারোহণ ও রূপার সূতার মত ছোট ছোট নদীতে মৎস্য ধরা বস্তুতঃ বড়ই আরামদায়ক। ফাতোয়াই (Fatoai) হোটেলটীও বেশ সুরম্য এবং এখানে আয়াসের সমস্ত সরঞ্জাম স্তরে স্তরে সজ্জিত।

মুরিয়া দ্বীপের পরিমাণ-ফল—৫৫ বর্গমাইল এবং লোক-সংখ্যা—২০,০০ হাজার। তোহিভিয়া পর্ব্বতের চূড়ার উচ্চতা ৩,৯৭৫´ ফিট এবং অন্যান্যগুলির উচ্চতা কম-বেশী ৩,০০০´ হাজার ফিট। মউয়াপুতা (Mouaputa) নামক এখানকার আর একটী পাহাড়ে এক বিরাট গহ্বর আছে;

তাহিতী হইতেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। এই পাহাড়ের পাদদেশের বিস্তীর্ণ উপত্যকা খুব নয়নাভিরাম। মুরিয়া ও তাহিতী দ্বীপে পীটেফল ও কলসীবৃক্ষ (Pitcher-fruit) দেখিতে পাওয়া যায়। পীটেফল শুকাইয়া দ্বীপবাসীরা পিষ্টকের ন্যায় ভক্ষণ করে এবং কলসীফল এত বৃহৎ যে, ফল পাকিলে অন্ততঃ মাথার মমতায় কেহ বৃক্ষতল দিয়া গমনাগমন করে না। এই দ্বীপের ডাক-টিকিটের উপর নারিকেল ও কামানের চিত্র অঙ্কিত। কামান স্বাধীনতা-সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এবং নারিকেল, জীবিকার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; বোধহয়, সেইজন্য ডাক-টিকিটের উপর এই অভিনব চিত্র-ব্যবস্থা। দ্বীপ-বাসীরা ইহাদের যে-জিনিসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, ডাক-টিকিটের মারফৎ অন্যান্য দেশ বাসীকে তাহা দেখাইয়াই ইহাদের আনন্দ।

মুরিয়া হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই রারোটোঙ্গা, কুক দ্বীপ প্রভৃতি ঘুরিয়া আসা যায়। মুরিয়া, অথবা পাপিতী হইতে মাত্র দেড়দিনের মধ্যে ষ্টিমার, রারোটোঙ্গা দ্বীপের অন্যতম বন্দর আভারুয়ার নিকটস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে সাগরকূলে নঙ্গর করে। দ্বীপবাসীরা যাত্রীদের তীরে লইবার জন্য নৌকা লইয়া জাহাজের গাত্র স্পর্শ করে। অতঃপর, যাত্রীদের ভ্রমণ-অভিযান শুরু হয়।

একজন প্রসিদ্ধ লেখকের ভাষায়—ইহাকে স্বর্গ-রাজ্যের ন্যায় চির-বসন্ত-বিরাজিত নাতি-শীতোষ্ণ আব-হাওয়ার কেন্দ্রস্থল বলা যাইতে পারে। শৈল-শিখরে মেঘমালার উপর গানের সুরের মত জলোচ্ছ্বাস দর্শকের প্রাণ-মন বিমোহিত করে। দিবালোকে একটী সুন্দর

কুক দ্বীপের পল্লী-দৃশ্য

মনোজ্ঞ দ্বীপের উপরে যেন অভ্রভেদী পাহাড়শ্রেণীর তুঙ্গ-শৃঙ্গ পাহারা দিতেছে বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। থক্‌থকে সবুজ সব্জী-বাগানের দুইটী সারি পাহাড়ের উপর দিয়া

২,০০০ হাজার ফিট উর্দ্ধে শিখরদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাদদেশে বেলাভূমি বেষ্টন করিয়া অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ

রারোটোঙ্গা দ্বীপের দৃশ্য

শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া এক অভিনব দৃশ্য সৃষ্টি

করিয়াছে। জলের রঙ গাঢ় নীল—দেখিলে চোখ জুড়ায়।

এই দ্বীপের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র আভারুয়া (Avarua)। ইহা নিউজিল্যাণ্ডের আশ্রিত। আভারুয়া, শান্ত-মধুর অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভার আদি লীলাভূমি। এখানে কয়েকটি আনন্দ দিন বা সপ্তাহ যদি কোন যাত্রীকে পরবর্ত্তী ষ্টিমারের অপেক্ষায় কাটাইতে হয়, তাহা খুবই সুখের। এই নীরব নিথর দেশে প্রবাসীকে সর্ব্বক্ষণ সোহাগ পরশে ঘুম পাড়াইতে থাকে।

সপ্তদ্বীপ

ইহার পর মহাসিন্ধুর ওপারের অন্যান্য দ্বীপগুলি দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হয়। রারোটোঙ্গার নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটী দ্বীপ আছে। ছোট্ট দ্বীপ হইলেও প্রকৃতি ইহাদের উপর প্রতিনিয়ত রাশি রাশি সৌন্দর্য্য বিলাইতেছে। এখানে পাখীরা নিকুঞ্জে বসিয়া মনের আনন্দে গান গায় —তাহাদের সুমধুর গানের ঝঙ্কারে সমগ্র দ্বীপ যেন আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠে। পাখীদের বর্ণ-বৈচিত্র্য অপরূপ; তাদের গাছের শাখায় নীড়-বাঁধা-ইঞ্জিনিয়ারিং কৌতূহলী দর্শকের উর্ব্বর মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া দেয়।

জলের নীচে মাছেরা কেলী করে—তাহা দেখিলে নয়ন সার্থক হয়। মনে হয়, মরজগত নয়—পরজগত, সৃষ্টির অপর পারের অজানা অচেনা স্বরগভূমি। এদেশের সবই নূতন, আনন্দময়, অফুরন্ত অপরিসীম প্রফুল্ল-নাচন।

এই দ্বীপের পরিধি বা দূরত্ব মাত্র ২৫ মাইল। উপকূল দিয়াই ভ্রমণ অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক। এই দ্বীপময় সাগর, অথবা সাগরময় দ্বীপের (!) সর্ব্বত্র বিভিন্ন ধরণের প্রচুর ফুল-ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলের মধ্যে বেশীর ভাগ নারিকেল, কমলা ও কলা এবং ফুলের মধ্যে গোলাপ, বেলা, চামেলী, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি লাল, শ্বেত, হরিদ্রা, নীল—নানারঙের। এইসব ফুল যখন হাওয়ার সাথে তালে তালে দুলিতে থাকে, তখন পথিকের হৃদয়-মন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই দ্বীপ-গুলিতে নিয়মিতভাবে ষ্টিমার নঙ্গর করে। এখান হইতে মারকুইসস্ (Marquisos) দ্বীপে যাওয়া যায়। তারপর টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের প্রধান বন্দর নুকুয়ালোফা (Nukualufa ও সুভার (Suva) পথে ফিজিদ্বীপে যাওয়াই সুবিধা।

নুকুয়ালোফার তীর দিয়া জাহাজ যাইবার সময়

এই শহরটী খেল্‌নার মত, অথবা ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চের আংশিক দৃশ্য সমতুল্য বোধ হয়।

টোঙ্গা

দূর হইতে দ্বীপবাসীদের প্রাচীন কায়দায় অভিবাদন ও অঙ্গভঙ্গি যাত্রিগণকে মুগ্ধ করে। জাহাজ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন-সমক্ষে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠে—শহরের একপ্রান্তে, সাগরকূলে অবস্থিত রাণী ও যুবরাজ কন্‌সর্টের শ্বেত-প্রাসাদ এবং তাহার আশে পাশে বহু পান্থপাদপ—(Travellers' palm)। জাহাজ যখন ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়, তখন, বালকের দল চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে—মালোলেলি, অর্থাৎ শুভদিন (Good-day)। এই ক্ষুদ্র দ্বীপকে বেশ্ বলা চলে—ইহা রহস্যময় ও হাস্যো-দ্দীপক অপেরার দেশ (country of comic opera)। ইহার একটী পাহাড়ের সানুদেশ হইতে ভীমবেগে জল গড়াইয়া পড়িয়া শত ফিট বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ইহার প্রস্রবণ হইতে উন্মত্তবেগে জলধারা অবিরাম প্রবাহিত হইয়া লক্ষ রামধনু সৃষ্টি করিতেছে। দূর হইতে এই ঝাপ্‌সা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে জাহাজ অন্তহীন মহাসাগরে বিলীন হইয়া যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সময় ফিজিদ্বীপে ভিড়িয়া থাকে।

ফিজি দ্বীপের সংখ্যা তুইশতেরও উপর; তন্মধ্যে, ভিটিলেবুর (Vitilevu) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফিজি

এই দ্বীপপুঞ্জ ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ নাবিক ট্যাসম্যান্ (Tasman) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ফিজি দ্বীপপুঞ্জও দক্ষিণ মহাসাগরের

নাশামু জলপ্রপাত

মধ্যে অন্যতম সুন্দর দ্বীপ। ইহা ব্রিটিশের শাসনাধীন। নাশামু জলপ্রপাত এই দ্বীপের প্রধানতম দ্রষ্টব্য এবং রাপিদ, ওয়াইকাগর্জ্জের অনুপম স্বভাব-শোভা দর্শককে যুগপৎ মুগ্ধ ও তন্ময় করিয়া ফেলে।

ফিজির কয়েকটী দ্বীপ পর্ব্বত-সঙ্কুল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহাদের উচ্চতা ৪,০০০ হাজার ফিট এবং বিবিধ লতাগুল্মে আবৃত। ভিটিলেভুর পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া রেভা নদী প্রবাহিত। এই নদীর মধ্য দিয়া পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টীমার চলাফেরা করিতে পারে।

ফিজির আব-হাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর। তাপ-শৈত্যের পরিমাণ ৬৩° ডিগ্রী হইতে ৯০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। অধিবাসীরা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু, বিদ্যোৎসাহী এবং অতিথিপরায়ণ। ইহাদের প্রধান ব্যবসায় ইক্ষু-চিনি, নারিকেলের শুষ্ক শাঁস, তাজা ফুল, শুক্তি, তামাক এবং ধান্যের চাষ।

এই দ্বীপগুলির মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর রাস্তা আছে। তন্মধ্যে, তেলেভো সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। মোটরযোগে, অথবা পদব্রজে অল্লায়াসে সর্ব্বত্র প্রদক্ষিণ করা যায়।

নুকুলুয়া ও বাকুয়া দ্বীপ দুইটী ক্ষুদ্র। ইহাদের

তরুণ ফিজিবাসী।

পশ্চাতে পাহাড় পরিবেষ্টিত রেভা নদীর তীরে সুরম্য বন্দর অবস্থিত। স্যর জন ফরেষ্টার (Sir John Forrester) এই দ্বীপ সম্বন্ধে একটী চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন...

নুকুলুয়া ও বাকুয়া

যোদ্ধা-বেশে ফিজিয়ান।

সুভা সমগ্র দ্বীপের প্রধান শহর বা রাজধানী। ফিজি দ্বীপের প্রাচীন রাজধানী লেভুকা। ইহার সৌন্দর্য্য এখনো দর্শককে মুগ্ধ করে। উপসাগরের চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত ধূসর পর্ব্বতরাজি ও বনের অপূর্ব্ব সৃষ্টি মানব-কল্পনাকে অতিক্রম করে। বস্তুতঃ ইহা দর্শককে আত্মহারা করিয়া দেয়। পর্ব্বত-

সুভা

গুলি দেখিলে ইহাকে অপার্থিব মায়া-রাজ্য বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। পুরাকালে দৈত্য-দানবের কথা শুনিয়া ফিজিয়ানরা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত—অতীতদিনে দ্বীপের অকাল যৌবনের কল্পনার সেই পুরাতন ভৌতিক তাণ্ডবলীলার কথাই বর্ত্তমান দিনেও স্মৃতিপটে স্পষ্ট করাইয়া দেয়। মনে হয় যেন, সুদূরের এই নিঝুম-নিরালা কালো কালো গিরি-সঙ্কটের সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গগুলির উপরই সেই পিশাচ-দানবের বিকট হাস্যধ্বনি ও ক্রীড়া-কৌতুক চলিত। এখানে আসিলে আজিও তাই দর্শকের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। উপনিবেশ-শাসন-কর্ত্তা সুভায় বাস করেন। সুভার রাস্তাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, উঁচু-নীচু এবং আঁকা-বাঁকা হইলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটী সুপ্রশস্ত রাস্তা কিছুদূর গিয়া সাগর-উপকূলে মিশিয়াছে। ইহা অনন্ত সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার—অক্ষয় শোভার রাণী!

ফিজি দ্বীপ হইতে সামোয়া যাওয়া যায়। অন্যান্য দ্বীপ হইতে সামোয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। ইহা যেন ভিন্ন জগত। খেলনা দ্বীপ (Toy Island) টোঙ্গা, হাপাই এবং ভাভো। বনানী পরিবেষ্টিত ফিজি অপূর্ব্বসুন্দর সত্য, কিন্তু

সামোয়া

ভাভো দ্বীপের দৃশ্য

সামোয়া স্বপ্ন-রাজ্যের সুবর্ণ-পুরী। এই রকমের দ্বীপ দক্ষিণ সাগরে আর দ্বিতীয়টী নাই।

আপিয়া বন্দর অতীব মনোহর। ইহা বিস্তৃত এবং সাগর-সঙ্গমে মিশিয়াছে। বন্দরের একদিকে সবুজ বনানী বেষ্টিত তুর্ভেদ্য পাহাড়, অপরদিকে নীল সাগরে-ঘেরা অথৈ জল। মনে হয় যেন দৃষ্টিসুন্দর সীমা-রেখার উপর বৈচিত্র্যময় রঙের উজ্জ্বল-মধুর সমন্বয়।

জাহাজ যখন বন্দরে নঙ্গর করে, তখন দলে দলে সামোয়া নর-নারী আরোহীদিগকে সাদর অভ্যর্থনা ও অভিবাদন জানায়। তাহারা পাখা, শুক্তি, ঝিনুক, প্রবাল এরোরুটের বল্কল, ফুল, প্রভৃতি যাত্রীদের নিকট বিক্রয় করে।

সামোয়ানরা সুদর্শন। তাহাদের দেহ সুগঠিত এবং তাহাদের হলদে চুল অতি সুন্দর দেখায়। প্রত্যেক শনিবারে সমগ্র দ্বীপটী যেন সাদা হইয়া যায়। সেদিন সামোয়ানরা মাথার চুলে শ্বেত-সুগন্ধি মাখিয়া দলে দলে প্রকৃতির বুকের উপর ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে এবং পরদিন রবিবার প্রত্যূষে দেহ-মস্তক পত্র-পল্লবের আভরণে সজ্জিত করিয়া সবুজ-প্রাণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে।

সামোয়ার টুপো বালিকারা 'প্রাচীন ফ্যাশানে

সুসজ্জিত হইয়া নগর-ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহারা খুব সুশ্রী; ইহাদের বংশ-মর্য্যাদাবোধ অত্যন্ত প্রখর। কোন কোন বিশেষ উৎসবাদিতে নগরের প্রধান ব্যক্তির সুদর্শনা
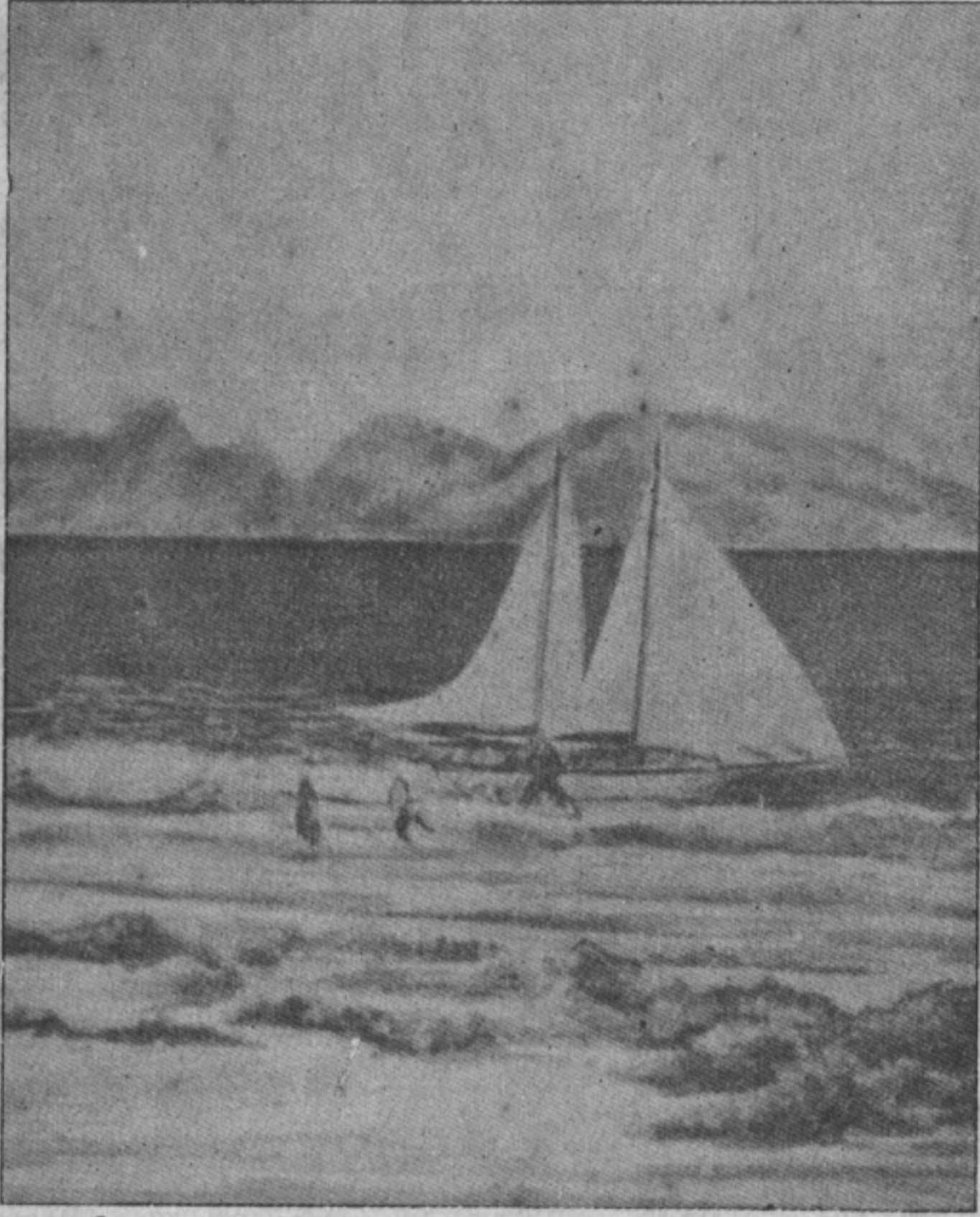
সামোওয়া দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য

রূপসী তরুণী কন্যা পুরাতন রীতিতে নৃত্য-গীত করিয়া থাকে। তখন, সামোয়ার প্রাচীন প্রথায় ইহারা কাপড় পরিধান করে। মাথায় ফুল পরে এবং কখনো কখনো

যোদ্ধবেশে মস্তকে হেল্‌মেট পরিধান করিয়া উৎসব-আসরে অবতীর্ণ হয়। এই কুমারীদের শিবনৃত্য বিশেষ প্রশংসনীয় এবং উপভোগ্য।

সামোয়া দ্বীপ—সৃষ্টির ও স্বভাবের অফুরন্ত দানে পরিপূর্ণ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ষ্টিভেন্‌সন এখানে বেড়াইতে আসেন। তিনি ধূসর ধূম্রময় পাহাড়শ্রেণীর উপর নিবিড় বনানীর মাঝে হাজার হাজার পায়রার বিচরণ ও কোকিলের কূজন শ্রবণ করিয়া এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এই দ্বীপে তিনি মরিতে বাসনা করেন। ভ্যালিমা নামক নগরে তিনি বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন এবং সেইখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর পাহাড়ের শীর্ষদেশে নারিকেল, তাল প্রভৃতি নানা বৃক্ষশ্রেণীর মাঝে, মুক্ত আকাশের নীচে তাঁহার শবদেহ সমাহিত করা হয়। সমাধি-গাত্রে অতঃপর নিম্নোদ্ধৃত স্মৃতিলিপি খোদিত হয়। ইহা ষ্টিভেন্‌সন নিজেই রচনা করিয়াছিলেন :

Under the wide and starry sky
Dig ye the grave and let me lie
Glad did I live and gladly die
And laid me down with a will

These be the words that ye grave for me
Here he lies whose he longed to be
Home is the sailor, home from sea
And the hunter home from the hill.

এই সমাধির পার্শ্বে দাঁড়াইলে প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার ষ্টিভেনসনের এই দেশে মরণের গভীর অনুভূতি দর্শকের অন্তর-মাঝে প্রতিনিয়ত ঝঙ্কার তুলিতে থাকে, মুহুর্ম্মুহু চক্ষু সজল হইয়া উঠে। মিঃ গ্রের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে ঃ

Oh I shall never forget you
Samoa eb galo etu.

সামোয়া উপকূল পরিত্যাগ করিয়া লেভূকা দ্বীপের পথে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা উপস্থিত হওয়া যায়।

"For always Roaming with a
hungry heart much have I see and known.

—Tennyson (Ulysus).

জাপান দ্বী পুঞ্জ এশিয়া মহাদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে দুই হাজার মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। জাপান

জাপান

সাম্রাজ্যের লোক-সংখ্যা – ৬,৪৪,৫০,০০৫ জন এবং—আয়তন ২৪,৬৩১ বর্গমাইল। সমগ্র দ্বীপের রাজধানী—টোকিও। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই

শহর স্থাপিত হয়। গগনস্পর্শী পর্ব্বতসমূহ ও তাহাদের সুরম্য চূড়া ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ফুজি পর্ব্বত সর্ব্বোচ্চ ও সুন্দর। পর্ব্বত গাত্র হইতে অনেকগুলি অপ্রশস্থ, অথচ খর-স্রোতস্বিনী প্রবলবেগে নামিয়া আসিয়াছে। ছোট-খাট নৌকা তন্মধ্য দিয়া চলাচল করিতে পারে না—তবে, ইহার ভীষণ জল স্রোত যন্ত্র-চালনায় বিশেষ সহায়তা করে। পাঁচটী বৃহৎ ও প্রায় ৪,০০০ হাজার ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া জাপান সাম্রাজ্য গঠিত।

শস্যোৎপাদনের উপযোগী স্থান জাপানে অতি অল্প। তবে, যেখানে আছে, সেখানকার জমি অত্যন্ত উর্ব্বর। ফলে, যথেষ্ট ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাপান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রাণী; ইহা অতুলনীয় শোভার জন্য চির-বিখ্যাত। এই সাগর-দ্বীপের অফুরন্ত প্রকৃতির দান সত্যই কল্পনাতীত—বর্ণনাতীত। বস্তুতঃ যে একবার দেখিয়াছে, সে মুগ্ধ হইয়াছে। স্রষ্টার সৃষ্টি-নৈপুণ্য এখানে আশ্চর্য্যরূপে বিকাশমান। চতুষ্পার্শ্বস্থ দিগন্ত প্রসারী অনন্ত মহাসাগরের অনুপম সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা ভাষার দ্বারা প্রকাশ অসম্ভব। মর্ত্ত্যের-স্বর্গ জাপানের মৃদু-মন্দ সমীরণ দর্শকের সারা অঙ্গে স্নেহের পরশ বুলাইয়া

যায়। সমূদ্রের বেলাভূমি নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের অক্ষয়-ভাণ্ডার —মনোহর স্বাস্থ্য-নিবাসগুলি সুঠাম স্বাস্থ্যাকাঙ্ক্ষীদের জন্যই নির্ম্মিত।

জাপান সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে : দুইজন দেবতা এই দ্বীপময় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের একজনের পুত্র সম্রাট জিম্মু বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিয়া ইহাকে নিজের শাসনাধীনে আনেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে জাপানের সহিত চিনের সম্বন্ধ। বহুশত বৎসর পূর্ব্বে চীনের খ্যাতনামা লেখকগণ জাপান-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। জাপানী সাহিত্য ও চিন্তাধারার উপর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন।

জাপান, প্রথমে ফেন্‌ডাল সিষ্টেমে শাসিত হইত এবং ক্রমাগত এই প্রথায় সাতশত বৎসর পর্য্যন্ত শাসনকার্য্য চলিয়াছিল। তখনকার দিনেও জাপান—বীরত্বে, শিক্ষায় ও আভিজাত্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। অতঃপর, এই শাসনের অবসান হয় এবং জাপান-রাজ্যে দৃঢ় রাজশক্তির প্রবর্ত্তন হয়। শক্তির চর্চ্চা, ব্যবসায়ের উন্নতি, জ্ঞানের উৎকর্ষ প্রভৃতি প্রসারের সূত্রপাত হয়, এই সময় হইতে।

আধুনিক জাপান—সম্রাট বা মিকাডো কর্ত্তৃক শাসিত
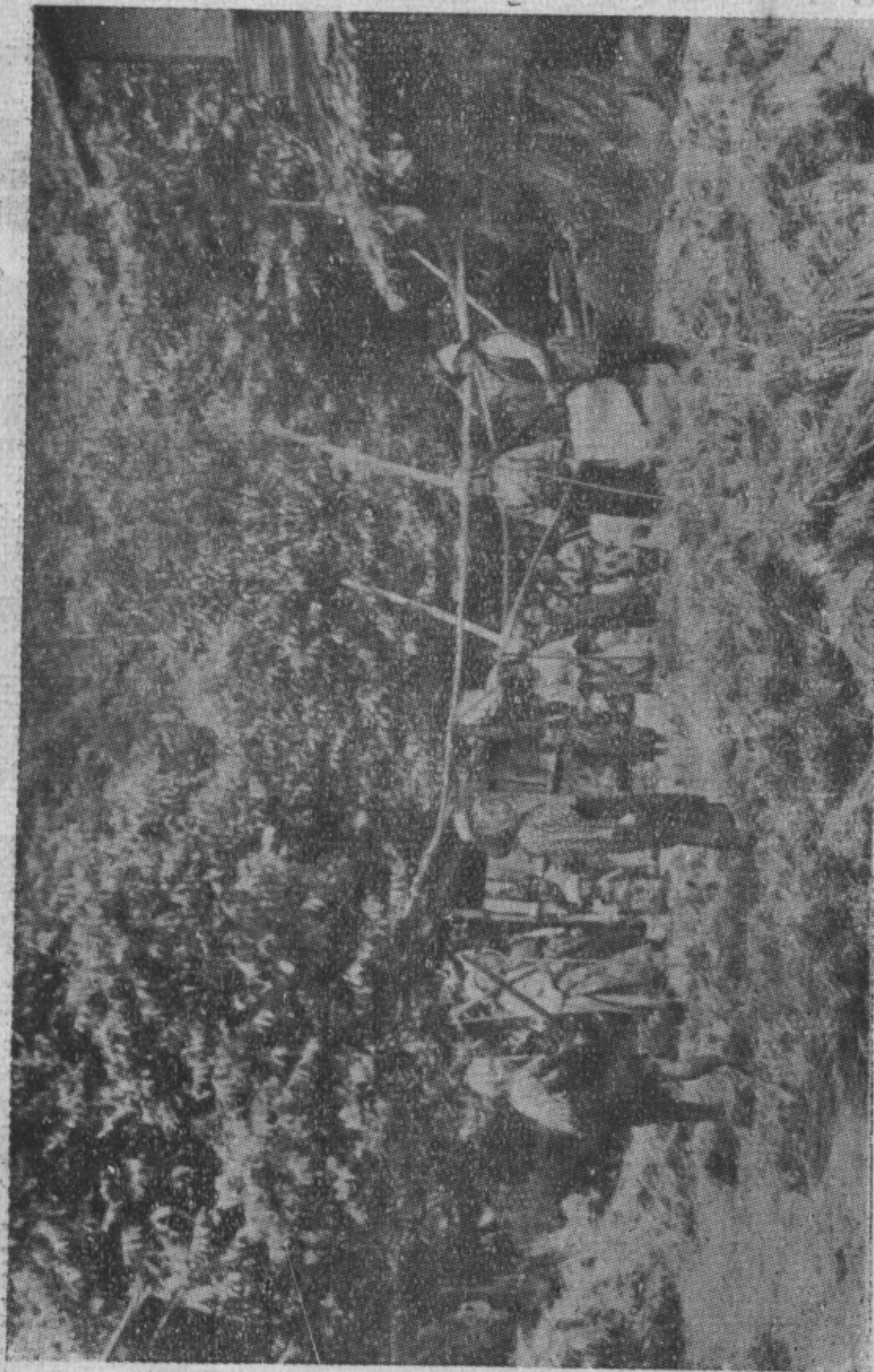
জাপানী কৃষকদের ধান্য ছাড়ানো

হইলেও তিনি সমস্ত রাজকার্য্য প্রিভি-কাউন্সিল ও ক্যাবিনেটের মতানুসারে করিয়া থাকেন। রাজ-পরিবারের লোক, দেশের কুট রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত এবং নেতাদিগকে লইয়া হাউস-অব-প্রেস নামে একটী সভা গঠিত হয়। যে-সমস্ত সদস্য সাধারণ প্রতিযোগিতায় নির্ব্বাচিত হন—তাঁহাদিগকে লইয়া হাউস-অব-রিপ্রেজিনটিটিভ্‌স্‌ গঠিত হয়।

বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধের পর হইতে জাপান সমগ্র জগতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ব্যবসায়-জগতে জাপানের স্থান শীর্ষে। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্দরসমূহে বিবিধ বাণিজ্য-দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ জাপানী জাহাজ দৃষ্ট হয়। যে-জাহাজের নাম 'মারু' সম্বলিত, তাহা জাপানী-জাহাজ বুঝিতে হইবে। যথা, টোকিও মারু, হেব্রো মারু ইত্যাদি। পাশ্চাত্য ব্যবসায় প্রণালীতে জাপবাসীরা নিজদিগকে সুদক্ষ শিল্পী বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। তাহারা প্রত্যহ নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জগতকে স্তব্ধ করিয়া দিতেছে। প্রায় যাবতীয় খেলনা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ও বিলাস-সম্ভার, সবই জাপানে প্রস্তুত হয়।

জাপানে শিক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক

বালক-বালিকাকে অন্ততঃ ৬ ছয় বৎসরকাল যে কোন শিক্ষালয়ে লেখাপড়া শিখিতেই হইবে। তারপর, যে

জাপানী তরুণী তাস খেলিতেছে।

যাহার কর্ম্ম বাছিয়া লয়। কর্ম্মময় জাপান-পথে কোন যুবক-যুবতী আস্তে হাঁটিলে তাহাকে রীতিমত দু'কথা

শুনিতে হয়। নিজেদের দেশীয় ভাষায় জাপানের নাম—'নিপ্পন'; যেমন, ইণ্ডিয়ার দেশীয় নাম—ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান। জাপানের শ্রেষ্ঠ কবি—ইয়েন নোগুচি এবং শ্রেষ্ঠ

কবি ইয়েন নোগুচি

ধনী মিট্‌সুই-পরিবার। বাঙ্গালা-প্রবাসী রাসবিহারী বসু জাপানে উচ্চরাজ-পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

জাপানে নানা প্রচলিত ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধ সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রকৃতি পূজকদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। মুসলমানের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাপানের সমস্ত রাজপথ আশ্‌ফ্যাল্ট বা পিচ্‌ মণ্ডিত, সমস্ত শহর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত। জাপানের ভিন্ন ভিন্ন নগরে যাইতে হইলে ট্রেণ, ষ্টিমার ও মোটরে যাওয়াই সমধিক সুবিধাজনক। এখান হইতে আমেরিকা, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার সর্ব্বত্র যাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের মাইক্রোনেশিয়া, মালো প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপ জাপানের অধিকারে। সেইসব রহস্যপূর্ণ দ্বীপে যাইতে হইলে জাপান সরকারের নিকট হইতে ছাড়-পত্র লইতে হয়।

জাপানে যতগুলি শহর আছে, তন্মধ্যে, টোকিও সর্ব্বপ্রধান এবং ইহাই জাপান-সাম্রাজ্যের রাজধানী।

টোকিও

এই শহরে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার লোক বাস করে। টোকিও'র পূর্ব্ববর্ত্তী নাম ইয়েডো। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মিকাডোর অধীনে আসে। তিনি ইহার নামকরণ করেন—টোকিও। বহুবার এই শহর আগুনে ভস্মীভূত হইয়াছে, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছে—কিন্তু, তথাপি ইহার অধিবাসিবৃন্দ হতাশ হয়

নাই। শহরের বর্ত্তমান আয়তন ১০০শত বর্গমাইলের উপর। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কল্যাণে শহর দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শহরের সহিত বিংশ

পৃথিবীর বিখ্যাত ধনী মিট্‌সুই পরিবারের কর্ত্তা

শতাব্দীর শহরের তুলনা হয় না। সেই পুরাতন নিয়ম, গৃহ-নির্ম্মাণের গতানুগতিক পন্থা এখন আর নাই। প্রাচীন-কায়দার বাড়ীসমূহ ভাঙ্গিয়া, তাহার স্থলে

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে নূতন নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। সমস্ত শহরে বৈদ্যুতিক ট্রাম লাইন, রেল মোটর এবং রেল লাইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সারা নগর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয় পুরুষেরা সাধারণতঃ ইয়োরোপীয় পোষাকে রাস্তা চলিয়া থাকেন। টোকিও'র সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থানের নাম—আকাশাক ও আজাবাস্; তবে, ভ্রমণকারীর দর্শনীয় খুব অল্প জিনিস এখানে বিদ্যমান। শহরে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ স্তূপ, মন্দির ও গীর্জ্জা দেখা যায়। ইউশুকিয়ান যাদুঘর নগরের শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য। তন্মধ্যে, বিভিন্ন দেশের অস্ত্র-শস্ত্র, জীব-জন্তু, শিল্পদ্রব্য সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। রাজপ্রাসাদ, উয়েনো পার্ক, আর্টগ্যালারী, পশুশালা, গিন্জার দোকান-শ্রেণী এবং শহরের ৫ম রাস্তা দ্রষ্টব্য।

জাপানের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নগরের নাম—ওসাকা। ইহার পূর্ব্বনাম—নানিওয়া। জন-সংখ্যা—২১,২০,০০০ উপর। বাণিজ্য ও শ্রমিক, কেন্দ্রের দিক দিয়া ওসাকা, সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শহর।

ওসাকা

জাপানের ক্রমোন্নতির বিষয় যথাযথ জানিতে হইলে ওসাকার বিবরণ সর্ব্বাগ্রে জানা দরকার। ইয়োডোগা-ওয়া নদীর তীরে এই শহর অবস্থিত। শহরের মধ্য দিয়া

বহু ছোট বড় নদী-খাল প্রবাহিত থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। গ্রীষ্মের মনোরম সন্ধ্যায় এইসব নদীর মাঝে অসংখ্য পাল খাটানো নৌকা দেখা যায়। জেলেরা ঐসব নৌকায় চড়িয়া জাল দ্বারা মৎস্য-শিকার করিয়া থাকে। সে দৃশ্য দেখিলে দর্শকের অন্তর-মাঝে অনির্ব্বচনীয় পুলক-শিহরণ ঢেউ খেলিয়া যায়। হামেদারা কৃষি-যাদুঘর, টেম্মা-বাসি, টেন্‌জিন-বাসি ও নানিওয়া-বাসি সেতুত্রয়, বিখ্যাত বিধ্বস্ত দুর্গ প্রভৃতি এই নগরের শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বস্তু। এখান হইতে যে সব জিনিস বিদেশে রফতানী হয়, তন্মধ্যে; ধান, তুলা, চিনি, ফস্‌ফেট রক্, ঔষধ, কাপড় প্রভৃতি প্রধান। বিদেশী ভ্রমণকারীদের থাকার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। অর্থব্যয় করিতে পারিলে হোটেলে আহার ও পরিধানের জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না। সুন্দর সুন্দর ধোলাই পোষাক অর্থের বিনিময়ে, অথবা ভাড়া পাওয়া যায়।

ওসাকা হইতে কোবে যাওয়ার সুন্দর যান-বাহনের ব্যবস্থা আছে। কোবে, জাপান-সাম্রাজ্যের তৃতীয় শহর।

কোবে

লোক-সংখ্যা—৫,৯০,০০০ পাঁচ লক্ষ নব্বুই হাজার। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতে জাপানের বিদেশী বাণিজ্য আরম্ভ হয়। সৌধ-

সমৃদ্ধির জন্য এই শহর বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

নিনোবিকি জল-প্রপাত

এখানকার সমস্ত সৌধ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রস্তুত। রিক্‌শ', অথবা ট্রেণযোগে ইকুটা মন্দির, নিনোবিকি জল-প্রপাত, মায়াসান পর্ব্বত চূড়া, আরিমা

গ্রীষ্ম-নিবাস, টাকারাটুকা, হিরাণো, নাকায়ামাডারা, টাকাদাও, কুবুটোইয়ামা, হিমিজি প্রভৃতি অল্প সময়ের মধ্যে দেখিয়া শেষ করা যায়। বিদেশী পর্য্যটক কোবে পৌছিয়া সমুদ্র-স্নান না করিয়া ছাড়েন না—বেলাভূমি হইতে সাগরের দৃশ্য বড়ই চমৎকার ও উপভোগ্য।

কোবে হইতে দিয়াশলাই, চা, তূলা, মাদুর প্রভৃতি দেশ-বিদেশে চালান হইয়া থাকে।

সম্প্রতি, এই শহরে একটী সুরম্য মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। মিঃ এ. কে. বোচিয়া এই মসজিদের পরিকল্পনা করেন। কলিকাতার মিঃ জিওয়ান বখ্‌শ ফিরোজ্‌দ্দিন এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণের জন্য ৬৬,০০০ হাজার ইয়েন দান করিয়াছেন এবং চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে ১১৮, ৭৭৪-৭৩ ইয়েন (জাপানী মুদ্রা)। ইহাই জাপান-সাম্রাজ্যের প্রথম মসজিদ—The Law of the rising sun observed.

কোবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া একজন পর্য্যটক গাহিয়াছেন:

Three months have passed
Since left the cherry blossom,
And now I admire the pine
tree of two trunks. (Basho)

জাপান-সাম্রাজ্যের মধ্যে নিক্কো একটী উল্লেখযোগ্য স্থান। প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকর্ত্তা এই নগরে ছড়াইয়া দিয়াছেন। জাপানে একটী প্রবাদ আছে—যে নিক্কো দেখে নাই, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই। ইহার অপূর্ব্ব শোভা ভাষায় প্রকাশ যায়না, শুধু অনুভব করিতে হয়। ইংরাজীতে এইস্থান সম্বন্ধে একটী কথা আছে: Do not use the word magnificent till you have seen Nikko. বস্তুতঃ সুন্দরের পূজারী স্রষ্টা স্বহস্তে, নিপুণতার সহিত নিক্কোর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশে, দূর-চক্রবালের আড়ালে অস্তগামী সূর্য্যের রূপের ছটা যে একবার দেখিয়াছে, জীবনে কখনো সে নয়ন-মন বিমোহনকারী দৃশ্যের কথা ভুলিতে পারিবে না। এই পার্ব্বত্য নগরের আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলির কোনটী বনের মধ্যে ঢুকিয়াছে, কোনটী পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়াছে, আবার কোনটী সাগর-সৈকতে মিশিয়াছে। নিক্কো হইতে টৌকিও'র দূরত্ব একশত মাইল। মিঃ ডব্লিউ. এস্. কেন তাঁহার 'এ ট্রিপ-রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড্' নামক পুস্তকে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নিক্কোর যে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আজিও তদ্রূপ

নিক্কো

রহিয়াছে, তবে, শহরের অন্যান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বের ছোট ঘর বর্ত্তমানের প্রাসাদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

জাপানের হিরোসাকী প্রাসাদ

নিক্কো হইতে ইয়াকোহামা যাওয়ার সুন্দর পথ আছে। এইস্থান না দেখিলে জাপান-ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ধরণীর বুকে বৈচিত্র্যময় এই স্থান অক্ষয়-সৌন্দর্য্যে ভরা।

ইয়াকোহামা

সমুদ্রপথে এখান হইতে কোবের দূরত্ব ৩৪৮ মাইল। ইয়াকোহামা দেখা শেষ করিয়া মিয়াজিমার পথে নাগাসাকি যাওয়া যায়।

নিপ্পনের একটী চমৎকার স্থান মিয়াজিমা। এখানকার জলাশয়ের জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, মৃদু মধুর সমীরণ

মিয়াজিমা

পরিব্রাজকের মনে অনাবিল শান্তি বিলাইয়া যায়। এই স্থান খুব পবিত্র। এখানে জীবহত্যা নিষিদ্ধ এবং কোন মানুষকে মারিতে দেওয়া হয় না, অথবা জন্ম লইতেও দেওয়া হয় না; কুকুর লইয়া যাওয়াও নিষেধ। হরিণগুলি এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, পোষা পায়রার ঝাঁক মানুষের হাত হইতে আহার সংগ্রহ করে ও কাঁধের উপর বসে। এখানকার মন্দির অতীব পবিত্র—ইহার সিঁড়ি ৬৪৮ ফিট দীর্ঘ। তাহার উপর শিল্পীর তূলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, নানা লতাপাতা, পাখী ও দেবতার মূর্ত্তি। মন্দিরের দরজা, চৌকাঠ প্রভৃতি কর্পূরকাঠে নির্ম্মিত।

নাগাসাকি হইতে কোম্বেটো, নারা, মোজি প্রভৃতি

ভ্রমণ শেষ করিয়া ফরমোসাদ্বীপে যাওয়া সঙ্গত।

নাগাসাকি

নাগাসাকির কথা উঠিলে পর্য্যটকগণ বলিয়া থাকেন : And when the 'white Empress' blows farewell to Nagasaki and speeds a cross the yellow sea, we feel that we must return again to these enchanting Isles of Cherry Blossoms and Chrysanthe mums.

কোয়েটো শহর ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে জাপানের রাজধানী ছিল—নারা। কোয়েটো

কোয়েটো

স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নারা হইতে রাজধানী এখানে উঠিয়া আসে এবং টোকিও-এ রাজধানী স্থানান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা বৈচিত্র্যময় বিশিষ্ট নগর নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

এই শহর ভ্রমণকালে দর্শকের মন-প্রাণ একটা অনবদ্য আনন্দরসে আপ্লুত হয়। রাস্তাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যান-বাহনাদি বেশ শৃঙ্খলার সহিত চলিয়াছে, কোথাও কোন কোলাহল নাই, বেশ নির্জ্জন-নিরালা; অদূরে হিগাশিয়ামা পাহাড়ের উচ্চ চূড়া পর্য্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ লতাপাতা এবং নিবিড়

অরণ্য এক মনোহর দৃশ্য রচনা করিয়াছে। সমস্ত শহরটী
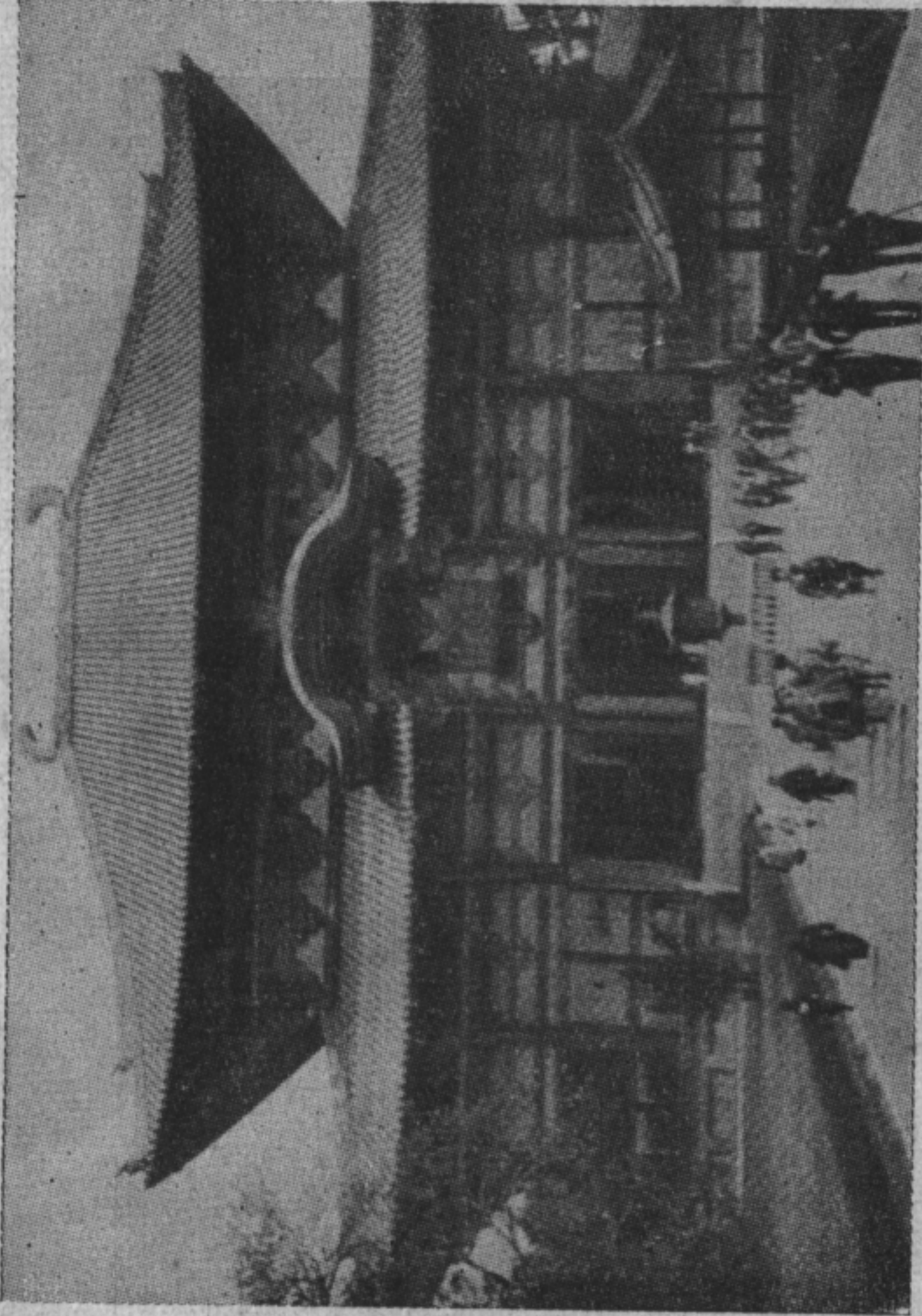
জাপানের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-মন্দির

তাহার প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছে। এখান হইতে নারা যাওয়া অধিকতর সুবিধাজনক। নারা ও জাপানের প্রাচীন রাজধানী। এ-শহর এখনো বেশ সমৃদ্ধিশালী।

অনেক দুষ্প্রাপ্য শিল্পজাত দ্রব্য-সম্ভার এখানকার ইম্পি-
রিয়াল মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে। কুশুগা মন্দির,

ব্রহ্ম-প্রবাসী জাপানী শিক্ষিতা তরুণী

সাঙ্গাৎসুডো বা তৃতীয় চন্দ্র-ভবন, নিগাৎসুডো বা দ্বিতীয়

চন্দ্র-ভবন, অতিকায় ঘণ্টা, সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত ডাইবুৎসুডেন বৌদ্ধ-মন্দির প্রভৃতি দেখার জিনিস। এই বৌদ্ধ-মূর্ত্তি পূর্ব্বে ব্রঞ্জমণ্ডিত ছিল, ইহার ওজন পাঁচশত টন। এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ-মন্দির ও বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। তাহার কোনটীর নাম সূর্য্যালোক-বুদ্ধ, কোনটীর নাম চন্দ্রালোক-বুদ্ধ। কথিত আছে : এই দুটী মূর্ত্তি মৃত্তিকা-শিল্পের চরম আদর্শ এবং প্রাচীন শিল্পীদের প্রশংসনীয় কীর্ত্তি। নারা হইতে দুই মাইল দূরে ইয়াকুশিজি, টোশোডাইজি এবং হোরিউজি নামক মন্দিরত্রয়ও অন্যতম দ্রষ্টব্য। এই বুদ্ধমর্ত্তিত্রয় ব্রঞ্জ নির্ম্মিত। এখানে ত্রিত্ববাদ সূচিত হয়।

নারা

হোরিউজি মন্দিরটী পঞ্চমতল, ইহার প্রধান কামরা এবং মধ্যম দরজা ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা পরিপূর্ণ নমুনা-সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত, এখানকার সরকারী উদ্যান, সারু সাওয়া জউয়ানায় ও অন্যতম দর্শনীয় জিনিস।

নারা হইতে ইলেকট্রিক ট্রামযোগে মোজি যাওয়া যায়। মোজি, জাপানের একটী অন্যতম বন্দর। এখান হইতে প্রতিদিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অনেক ছোট ছোট দ্বীপে জাহাজ যাওয়া-

মোজি

আসা করে। বাহির হইতে প্রত্যহ অনেক জাহাজ কয়লা বোঝাই করিবার জন্য এখানে আসে। মোজির নিকটবর্ত্তী কিয়ু দ্বীপে নানাজাতীয় শস্য উৎপন্ন হয়। মোজিতে সরকারী এবং বেসরকারী বহু কল-কারখানা বিদ্যমান। মোজির পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র ত্রিকোণাকার। পর্য্যটকেরা ইহাকে জাপানের ক্ষুদ্র মেডিটেরিনিয়ান বলিয়া থাকেন। দেশীয় বাড়ীগুলি চমৎকার, তাহার বাসিন্দারা এই সমুদ্রকে অনেকটা হ্রদের মত ব্যবহার করে। জাহাজ যখন মোজির নিকট-কুরুশিমা সঙ্কীর্ণ প্রণালী দিয়া যাইতে থাকে, তখন চোখের সাম্‌নে এক অতুলনীয় ও অভাবনীয় দৃশ্য চোখের সম্মুখ দিয়া পট বদলাইয়া যাইতে থাকে। সে মনোহর দৃশ্য অবর্ণনীয়। অতঃপর, জাহাজ শান্নুকী সমুদ্রোপকুল দিয়া যাইবার সময় ইয়াশিমা যুদ্ধের কথা স্মরণে আসে। ডানুরা সাগরকূলে মিনামোটো ও টায়রা সৈনিকদলের মধ্যে, মধ্যমযুগে এই ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুর্ব্ববর্ত্তী দলের কাছে গিয়া থামিয়া যায়। ইহা ব্যতীত, শোডোশিমা দ্বীপ এবং কানাকাকি উপত্যকা মোজির অন্যতম দ্রষ্টব্য। পর্য্যটক এখানকার দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিয়া আওয়াজি দ্বীপ এবং অপর তীরস্থ আধুনিক আকাশি শহর,

মাইকো, সুমা

মাইকো এবং স্থমা দেখিয়া কোবে ফিরিতে পারেন।

এইস্থান সম্বন্ধে এক পর্য্যটক কবি গাহিয়াছেন ঃ

In lessoning dimness the morrow wakes
　　On Akashi strands, all clad in mist :
I follow the boat in the course she takes
　　Behind the isle where the sight is missed.

মোজির নিকটবর্ত্তী হোণ্ডো, কিউশু এবং শিকোকু দ্বীপত্রয় দর্শনে দর্শককে যুগপৎ মোহিত ও আনন্দিত করিয়া তোলে। এই দ্বীপগুলির চতুঃপার্শ্বে বহুশত ক্ষুদ্র দ্বীপ বর্ত্তমান থাকিয়া সাগরের বুক সম্পদশালী করিয়া রাখিয়াছে। এইসব দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে প্রত্যহ জাহাজ গতিবিধি করে। সাগরের বুকে বহু সমুদ্র-পাহাড় শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দ্বীপের আশে-পাশে অসংখ্য পাইন বৃক্ষের সারি আত্ম-ভোলা দর্শকের মন-প্রাণ কোন্ সুদূরের দেশে ভাসাইয়া দেয়। আরিমা, আমানো, হাশিদাতে, হাকোন, কামাকুরা, কারুইজাওয়া, মাৎসুশিমা, কোরাসাকোব প্রভৃতি স্থানগুলিও জাপানের দ্রষ্টব্য।

হোণ্ডো, কিউশু, শিকোকু

এখন আমরা জাপান-শাসিত মাইক্রোনেশিয়ার কথা বিবৃত করিব। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছোট-বড় অসংখ্য দ্বীপ, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে রহস্যাবৃত হইয়া আছে।

মাইক্রোনেশিয়া

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাপান-শাসিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ হাজার হাজার দ্বীপের সমষ্টি রহস্যময় মাইক্রোনেশিয়া নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। যে দ্বীপগুলির কিছু প্রসিদ্ধি আছে, তাহাদের মোটসংখ্যা চৌদ্দশত। ইহারা সাগরের বুকে ১৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত দ্বীপের মধ্যে ইয়াপ, ম াপ, মারিয়ানাস, ক্যারোলিসিন, মার্শাল্স্, সোচুগান, সাটো বেনিন্ ল্যাড্রোনস, ও'গাসাওয়ারা, ওয়াম, গুয়াম, উরাকাস, রুমং, মগমগ, পালাউ, পালায়ু, সাইপাস, টিমিয়াস, রোটা, পোনাপে, কুশেয়ি, ট্রক প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বৈচিত্র্যময় মাইক্রোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বহুদেশ প্রথমে স্পেনের অধিকারে ছিল। ক্রমে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণ যুক্ত-রাজ্যের শাসনাধীনে আসে। ফলে, মাইক্রোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের উপর উপযুক্ত দৃষ্টি রাখা স্পেনের পক্ষে সম্ভব হইল না। ইহার পর

আমেরিকার সহিত স্পেনের যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। যুদ্ধ যতই স্থায়ী হইতে লাগিল, ততই স্পেনের অভাব বাড়িয়া

মোজির বিখ্যাত হ্রদ
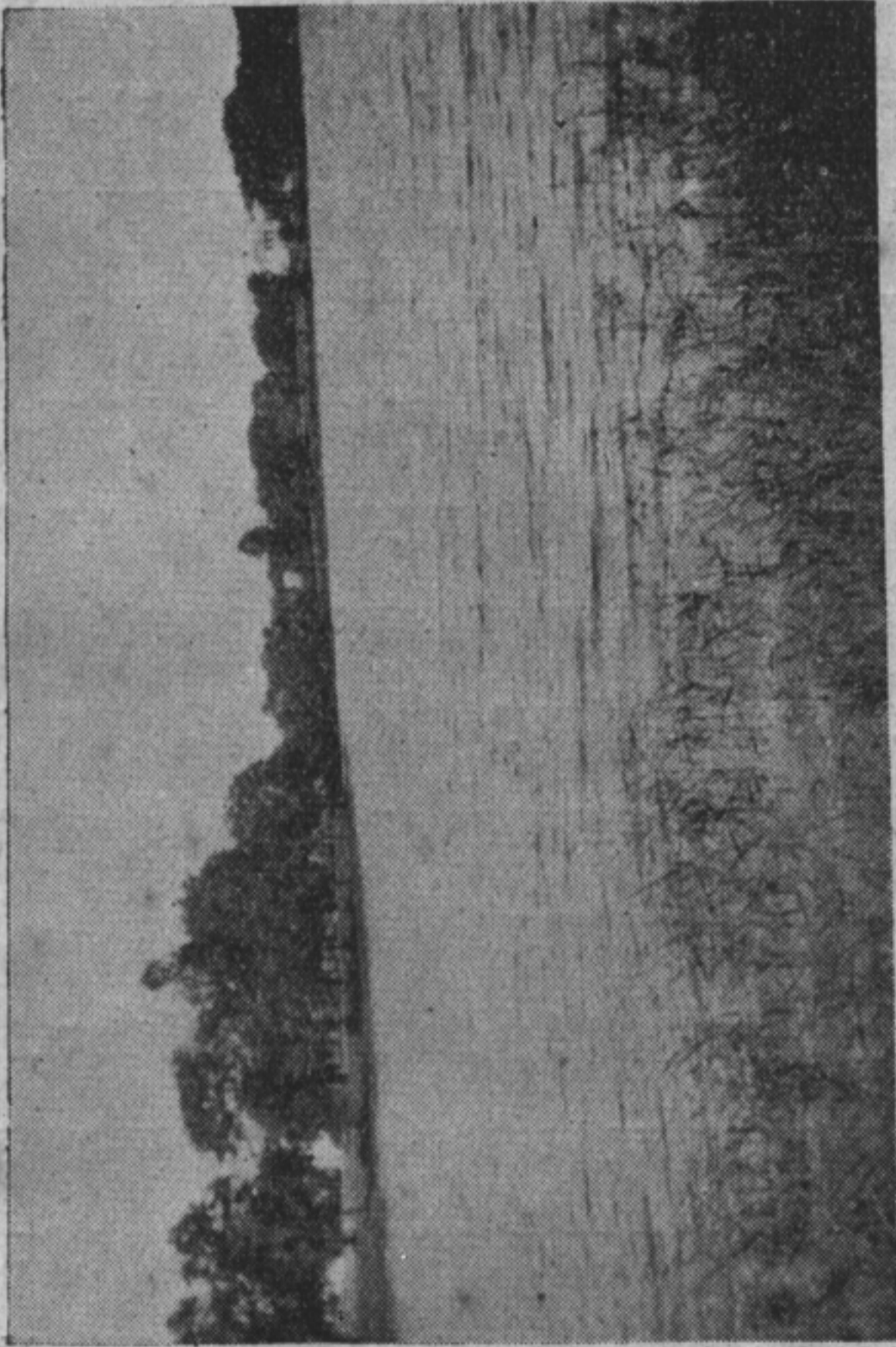
যাইতে লাগিল। অতঃপর, দারুণ অর্থাভাবে পড়িয়া স্পেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মাইক্রোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ জার্ম্মানীর নিকট প্রায় বারো কোটি টাকায় বিক্রয় করে। এই দ্বীপপুঞ্জের উপর জাপানের শ্যেন-দৃষ্টি বহুদিন হইতে

ছিল, কিন্তু, সুযোগের অভাবে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বিগত ইয়োরোপীয় মহাসমরে জাপান, মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া প্রথমেই রণতরী বহর পাঠাইয়া মাইক্রোনেশিয়া অধিকার করিয়া লয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই সন্ধির সময় শান্তি-সংসদে, জাতি-সঙ্ঘ জাপানকে এই দ্বীপগুলির উপর পূর্ণ শাসনাধিকার প্রদান করেন। নানা রাজনৈতিক কারণে পরে জাপান রাষ্ট্রসঙ্ঘ ছাড়িয়াছে, কিন্তু এই ম্যাণ্ডেটটি ছাড়ে নাই। এক আশঙ্কা জার্ম্মানীর, কিন্তু বর্ত্তমানে জাপানের সহিত জার্ম্মান বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ, সুতরাং সে ভয়ও নাই। সুতরাং জাপান তাহার প্রবল বাহু সম্প্রসারণ করিয়া এই দ্বীপপুঞ্জের উপর প্রভুত্ব করিয়া চলিয়াছে।

এই দ্বীপপুঞ্জ যখন জার্ম্মানীর অধিকারে ছিল, তখন, এখানে যাইতে হইলে হামবুর্গ হইতে যাত্রা করিতে হইত। ইহা এখন জাপানের শাসনে, কাজেই, জাহাজে উঠিতে হয় ইয়াকোহামা বন্দর হইতে এবং একমাস পরে এই রহস্যাবৃত দেশে পৌঁছা যায়। এই সমস্ত দ্বীপে অসংখ্য জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ও প্রবালসমন্বিত মরুদ্যান দেখা যায়। উরাকাস্ নামক অগ্নিগিরি হইতে অনবরত ধূম, লাভা প্রভৃতি বাহির হইতেছে। ইহার শীর্ষদেশে

তুষার স্তূপের পরিবর্ত্তে গন্ধক রহিয়াছে। সমগ্র পাহাড়ে একটী তৃণের নাম-গন্ধ নাই—উষ্ণ পাহাড় সর্ব্বক্ষণ গর্জ্জন

উরাকাস ও ওয়াম

করিতেছে। সে গর্জ্জন শ্রবণে বিদেশী পর্য্যটকের গায়ের রক্ত শুকাইয়া যায়। ইহার উচ্চতা ১০´৪৭ হাজার ফিট। উরাকাস্ দ্বীপের
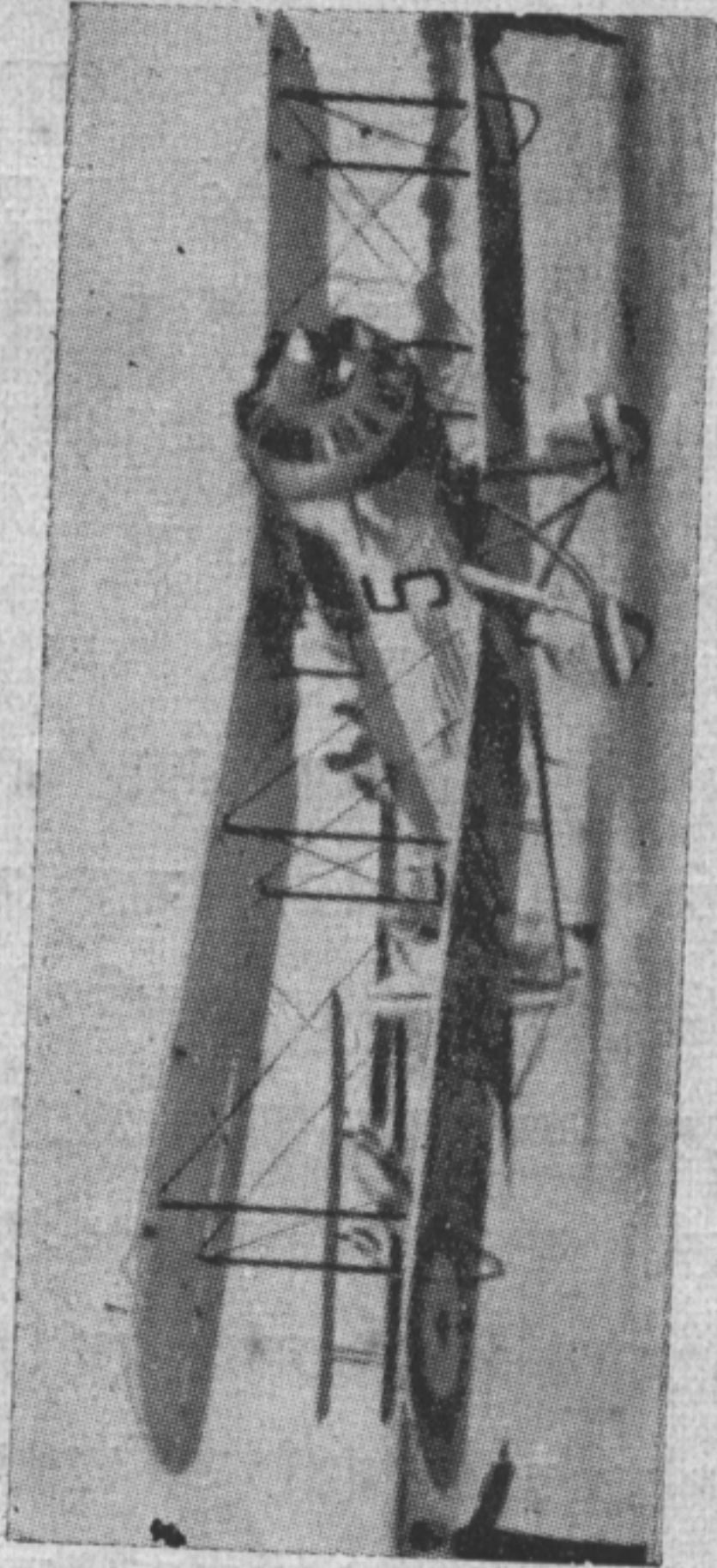
ওয়াম দ্বীপের বিমান ঘাঁটি

নিকটবর্ত্তী ওয়াম দ্বীপে সম্প্রতি বিমান-ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে। তিনমাস অন্তর একবার এখানে জাহাজ আসিয়া থামে।

এখান হইতে আরও কিছুদূর গেলে ইয়াপদ্বীপ চোখের সম্মুখে পদ্মের ন্যায় ভাসিয়া উঠে। ইয়াপ অর্থে ভূমি। এখানকার অধিবাসীরা মনে করে, ইহাই জগতের মধ্যস্থল।—এই স্থান ব্যতীত জগতের আর কোথাও যে ভূমি আছে, ইহা তাহাদের ধারণার অতীত। ভূত-যোনি, দৈব-দানবের উপর এদেশবাসীর অগাধ বিশ্বাস। বড় ছেলে-মেয়েরাও আগে সর্ব্বক্ষণ উলঙ্গ হইয়া বেড়াইত—জাপানের চেষ্টায় এখানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও সভ্যতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ফলে ছেলেমেয়েরা কাপড় পরিয়া স্কুলে যায় বটে, কিন্তু, ছুটির ঘণ্টায় সঙ্গে সঙ্গে কাপড় গুটাইয়া বগলে করিয়া ছুট্ দেয়। আধুনিক দুই একজন যুবক সাইকেলও চড়ে, কখনো টেনিসও খেলে। যুবকেরা আস্তে আস্তে বিদেশীর অনুকরণে অভ্যস্থ হইতেছে বলিয়া বৃদ্ধেরা তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেছে। বৃদ্ধের দল বৈঠক করিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে, এর ফল আশঙ্কাজনক; দেবতারা রাগ করিয়া কোন্‌দিন দেশে

ইয়াপদ্বীপ

মাইক্রোনেশিয়ার বালক কাপড় পড়িতে চায় না (ইয়াপ)

মহামারী, প্লাবন ও ধ্বংস লাগাইয়া দিবেন। সেদিন সকলের মৃত্যু অনিবার্য্য এবং সেদিন আসিতে দেরী নাই ; হয়তো বা আসিল বলিয়া !—

বিদ্যালয়ের বালকেরা অঙ্ককে খুব ভয় করে, কিন্তু, মৎস্য শিকারে খুব পটু এবং দীর্ঘ নারিকেল, শুপারী ও পিটেগাছে চড়িতে মজবুত। এইদ্বীপে ইঁদুরের সংখ্যা খুব বেশী—তাহারা শুপারী, নারিকেল প্রভৃতি কাটিয়া একাকার করিয়া ফেলে। এই উৎপাত নিবারণের জন্য জাহাজ বোঝাই করিয়া অন্যদেশ হইতে বিড়াল আমদানী করা হয়। কিন্তু, ফল হইল বিপরীত, বড় বড় মুষিকেরা দল বাঁধিয়া একযোগে বিড়ালকুলকে আক্রমণ করিল। দুই দলের মধ্যে রণদামামা বাজিয়া উঠিল প্রবলবেগে। শেষ পর্য্যন্ত, মার্জ্জারবাহিনী সবংশে নিহত হইল—মুষিকের একছত্র রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইয়াপবাসীরা নৌ-বিদ্যায় খুব পটু। ইহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, হ্রদের উপর সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়—ছোট ছোট ডোঙ্গায় চড়িয়া মৎস্য শিকার করে। অনেকে হাঙ্গর ও শুশুকের মাংস ভক্ষণ করে। নদীর মাছ, নারিকেল, পিটেফল প্রভৃতি ইহাদের প্রধান আহারীয় দ্রব্য এবং মাংস, রুটি প্রিয় খাদ্য। মেয়েরা

কাঁচা শুপারী, অচিন গাছের পাতা ও চূণ একত্রে মুখে পুরিয়া চিবায়, কেহ মিশি দিয়া দাঁত কাল করে। যাহার দাঁত যত কাল, সে তত সুন্দরী; এমনই অদ্ভুত ইহাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান। কথায় বলে: সংসর্গে রুচিরও পরিবর্ত্তন হয়।

কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেল—চারিদিকে শোকের চিহ্ন পরিস্ফুট। বিগত স্বামীর শোকচিহ্ন স্বরূপ কাণের ছিদ্র বড় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার অন্য-দিকে নূতন স্বামী গ্রহণ করা হইয়াছে। সে স্বামীটি অদূরে বসিয়া কাসিতেছে। দুইজন ওঝা ঝাড়-ফুঁকের দ্বারা তাহার কাসি রোগের ভূত তাড়াইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া ভ্রমণকারী ওইলার্ড প্রাইস বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছেন:

Her husband died a week before... Her new husband—the merry widows of Yap see no incongruity in talescoping mourning and matrimony was having a treatment....

গৃহস্বামী মারা গেলে ইহারা বাড়ীর কোন ফল ভক্ষণ করে না বা অতিথিকে ভক্ষণ করিতে দেয় না। কলা,

নারিকেল পিটেফল প্রভৃতি এক বৎসর পর্য্যন্ত তলায় পড়িবে, পশুতে খাইবে, গাছে পাকিবে, পাখীতে খাইবে—পচিয়া-শুখাইয়া মাটি হইবে। তথাপি, কেহ খাইতে পারিবে না। খাইলে অমঙ্গল অনিবার্য্য! বাড়ীতে ফল থাকা সত্বেও ইহারা ফল কিনিয়া খায়।

এক সময় কতকগুলি পরাজিত অসভ্য উপজাতি ধৃত করিয়া ইয়াপ দ্বীপে আনিয়া আটক করা হয়। ক্রমে, তাহারা ক্রীতদাস বনিয়া যায়। স্বাধীন মানুষের খাদ্য তাহাদের অভক্ষ্য। তাহারা মাথায় চিরুণী ব্যবহার করিতে পারে না। চিরুণী শুধু স্বাধীন মানুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট। যাহার বংশ-মর্য্যাদা যত বেশী, তাহার চিরুণী তত বড়, এগুলি সাদা কাঠ হইতে নির্ম্মিত হয় এবং দুইপার্শ্বে দাঁড়া-সমন্বিত। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যথাক্রমে ৩″ ও ৬″ ইঞ্চ। মগমগপ্রবাসী ইয়াপগণ শুধু এই নিয়ম মানে না।

ইয়াপ দ্বীপে বহু কুসংস্কার আছে। তন্মধ্যে একটী—পরিবারে যতগুলি পুরুষ থাকিবে, ততগুলি পাত্রে রান্না করিতে হইবে। কোন পুরুষ, নারীর পাত্রের রান্না খাইলে সে, স্ত্রীলোকের দাস বনিয়া যায়। তবে, মেয়েরা মায়ের পাত্রের রান্না খাইতে পারে। আহারের সময়

মাইক্রোনেশিয়ার বালিকা ঘাস-পাতা পরে (ইয়াপ)

পুরুষেরা স্ত্রীলোকের দিক পিঠ ফিরাইয়া বসে, যাহাতে তাহাদের দৃষ্টি আহারের উপর না পড়ে।

ইয়াপদ্বীপে ১২ জন রাজা আছেন। প্রত্যেকের অধিকার কম হইলেও নিজেদের রাজত্বের মধ্যে তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা বিদ্যমান। রাজ্য-সীমার মধ্যে রাজার আদেশই আইন। ইঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে একদল করিয়া জমিদার ও ক্রীতদাস আছেন। কোন স্বাধীন লোক দাসদিগকে কোন কাজের হুকুম করিতে পারে না। রাজাদেশ লইয়া যে কেহ তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারে। এজন্য রাজাকে তামাকু, অথবা, নারিকেল উপঢৌকন দিতে হয়। দক্ষিণ-সমুদ্র-দ্বীপ-বাসীরা কানাকা জাতি নামে পরিচিত। সুদূর অতীতে এই সমস্ত দ্বীপ বিদেশী নাবিকদের আড্ডা ছিল। তাহারা এদেশে নানা ব্যাধির জীবাণু ছড়াইয়া যাইত। তাহাদের সংসর্গে এই জাতির সৃষ্টি। জাপানের চেষ্টায় ইহারা জমি চাষ করিতেছে, জামা-কাপড় পরিতেছে, বাইসাইকেল চড়িতেছে এবং ছেলেমেয়েরা খেল্না ব্যবহার করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষার সঙ্গে রোমান অক্ষর জুড়িয়া বর্ণ-পরিচয় করিতেছে। ইহারা আস্তে আস্তে সভ্য হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বৃদ্ধেরা প্রমাদ

জাপানের প্রথম মস্‌জিদ (কোবে)

গণিতেছে, তবে, কোন উপায় নাই বলিয়া হতাশ হইয়া ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়াছে।

কতকগুলি দ্বীপ প্রবালসমন্বিত এবং নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির উপর বিরাজিত। প্রবালসমন্বিত দ্বীপগুলি
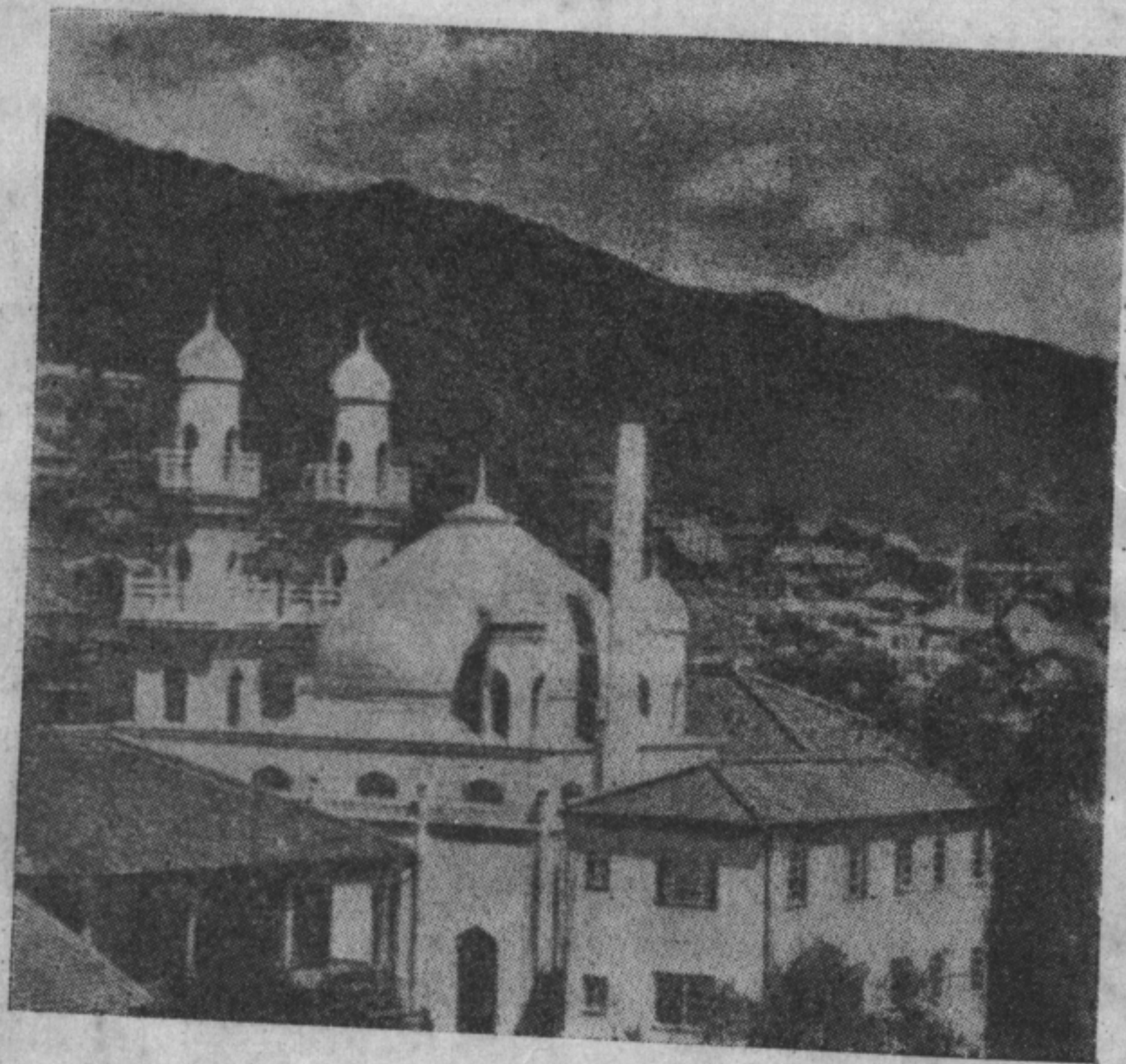
এরোপ্লেন হইতে কোবের মস্‌জিদ (জাপান)

খুব উর্ব্বর। জাপানীরা এইসব জমিতে নানা ফসল উৎপন্ন করে, ফলের উদ্যান রচনা করে এবং সর্ব্ববিষয়ে তাহাকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তোলে। এখানকার একটা

পাহাড়ের অনতিদূরে একটা প্রকাণ্ড স্তূপ আছে। এক জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক এই স্তূপ আবিষ্কার করিয়া ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণায় মন দেন। তিনি অতঃপর বলেন : প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে পাখীরা এইস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া আসিতেছে এবং সেই উপাদানের উপর এই স্তূপ প্রতিষ্ঠিত। জাপানীরা জাহাজ বোঝাই করিয়া এই পাখীর পুরীষ সাররূপে স্বদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

ইয়াপদ্বীপের মুদ্রা অদ্ভুত। মধ্যস্থলে ছিদ্রযুক্ত এক একখানা প্রকাণ্ড পাথর এ-দেশের মুদ্রা। এক একটি মুদ্রা দ্বারা কতকগুলি গ্রাম কিনিয়া ফেলা যায় এবং ইহা সহজে জাল, অথবা চুরি করা সম্ভব নহে। মুদ্রাগুলি সাধারণতঃ বাড়ীর সম্মুখে ফেলিয়া রাখা হয়, ইহা তাহাদের বংশ-মর্য্যাদা ও সম্পদের চিহ্ন। যাহার মুদ্রা যত বড়, সে তত বড় ধনী।

ইহা জাল করা যায় না তাহার কারণ, এই দ্বীপে কোন পাহাড় নাই বা এই পাথর জন্মে না। বস্তুতঃ ইহা তিন শত মাইল দূরে পালাউ দ্বীপে জন্মে। তথা হইতে ডোঙ্গায় উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রপথে এতদূর এই সকল পাথর-মুদ্রা আনা খুবই বিপজ্জনক। আইরিশ

ব্যবসায়ী ক্যাপ্টেন ডেভিড-ডি-ও'কিফ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া পালাউ দ্বীপ হইতে তিনখানা বৃহৎ
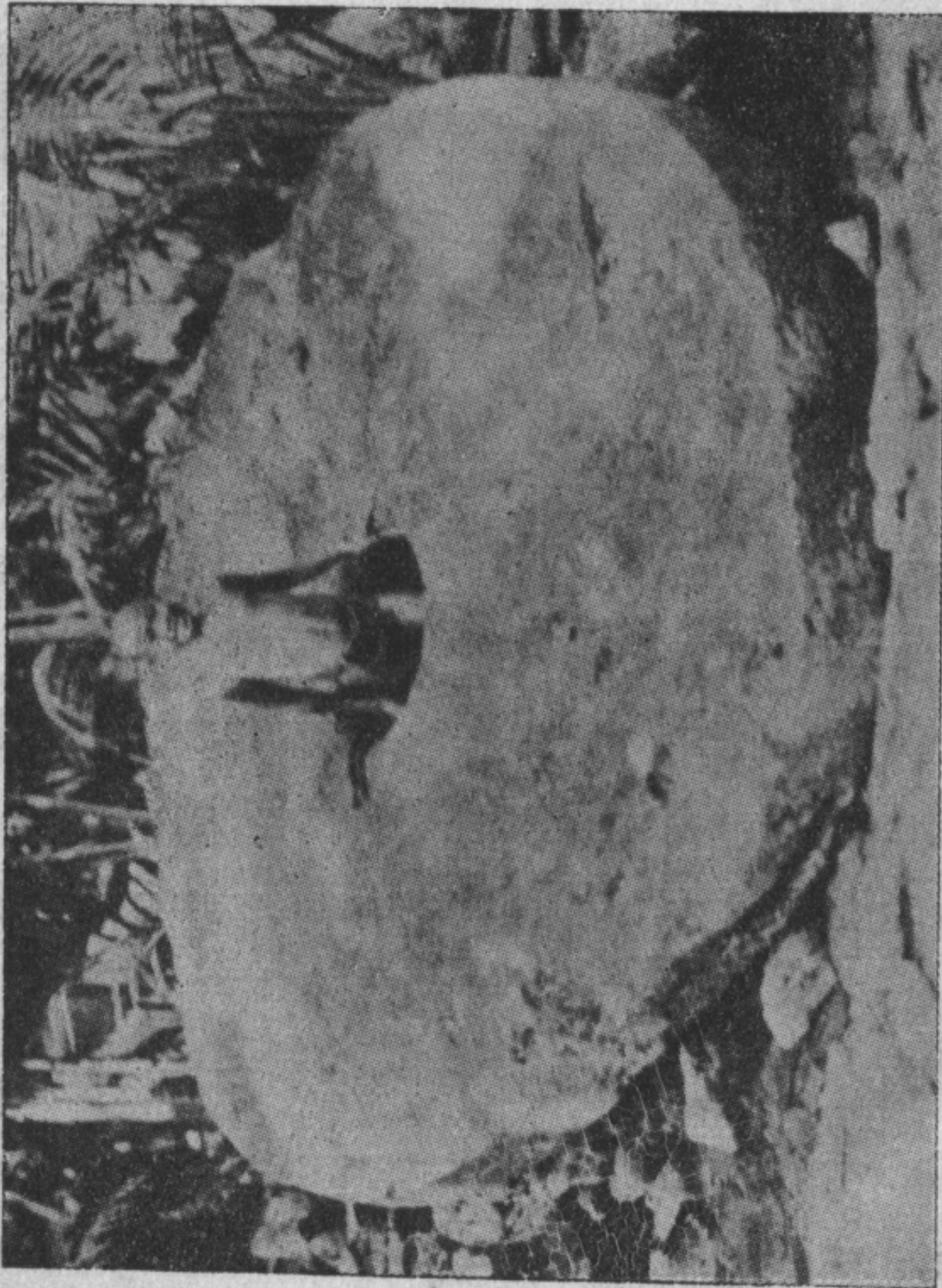
এই পাথর মুদ্রাখণ্ড দ্বারা মাইক্রোনেশিয়ার বহু গ্রাম ক্রয় করা যায়

পাথর-মুদ্রা আনেন। তাহার বিনিময়ে ইয়াপবাসীদের

নিকট হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বিদেশে নারিকেল চালান দিয়া অল্পকালের মধ্যে বড়লোক হইয়া যান। সুতরাং, ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইয়াপদ্বীপের টাঁকশাল হইতেছে—পালাউ দ্বীপে। এই দ্বীপে শুক্তি-মুদ্রারও প্রচলন আছে। একটা বড় শুক্তি-মুদ্রা দ্বারা দুই বোতল তৈল ক্রয় করা যায়। চামোরা নামক স্প্যানিশ বংশোদ্ভুত একজাতীয় লোক এখানে বাস করে। তাহারা জেমস্ উনটালান, টিরেসা, জোস প্রভৃতি ধরণের নাম ধারণ করে। ইহারা অনুকরণপ্রিয়। জাপানী-মুদ্রা (ইয়েন) ইহারা ব্যবহার করে; কিন্তু, কামাকারা সংস্কারবাদী। তাহারা পাথর-মুদ্রা ও শুক্তি-মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোন মুদ্রা ব্যবহার করে না। বিনিময়প্রথাও এদেশে বিদ্যমান। একটা নারিকেল দিলে একটা চুরুট, একটা ম্যাচ-বাক্সের পরিবর্ত্তে দুইটা শুপারী, দশটা শুপারীর বিনিময়ে একখণ্ড রুটী, এবং ডিম, মুরগী, শূকর প্রভৃতিও বিনিময়-প্রথায় পাওয়া যায়।

সমুদ্রের মধ্যে যেখানে তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষাকৃত অল্প, তথায় শুক্তির চাষ হয়। শুক্তি তুলিয়া বিশেষ সন্তর্পণে তন্মধ্য হইতে মুক্তা বাহির করা হয়।

পোনাপে দ্বীপে কতকগুলি প্রাচীন ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রবীর সাইয়োনজীর পুত্র যুবরাজ ইহার ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

পোনাপে

একস্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত ৫টী দুর্গ অবস্থিত রহিয়াছে। কমপক্ষে সমুদ্রপথে ১৫ মাইল দূর হইতে সেইসব পাথর আনা হইয়াছিল। এক সঙ্গে কুড়িখানা দেশীয় নৌকা তথায় পাঠাইলেও একখানা ফিরিয়া আসে কিনা সন্দেহ। এমতাবস্থায়, কি উপায়ে অতীতদিনে এইসব পাথর আনীত হইয়াছিল, তাহাই হইতেছে বর্ত্তমানের গবেষণার বিষয়। এই দ্বীপে কোন পথ নাই, তৎপরিবর্ত্তে রহিয়াছে বহুসংখ্যক খাল।

অতীতদিনে যাহারা একটীর পর একটী পাথর স্থাপন করিয়া এই দুর্গ রচনা করিয়াছিল, ইহার শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, তাহারা সভ্যজাতি। অথচ, তাহাদের কোন ঐতিহাসিক সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না—ইহাই অনুসন্ধিৎসুদের বর্ত্তমান বিস্ময়!

কতিপয় পর্য্যটক সাহসে ভর করিয়া ভগ্ন দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহারা তন্মধ্যে শুক্তির কুঠার, সূচ, হার এবং মনুষ্য-কঙ্কাল প্রাপ্ত হন। লোক মুখে শুনা

যায়, চাউ-টে-লিচুর নামক একটী রাজবংশ প্রাচীন যুগে এই দ্বীপে রাজত্ব করিত। ইদজিকলকল নামীয় এক বর্ব্বরজাতি যুদ্ধ করিয়া রাজবংশকে ধ্বংস করে। সঙ্গে

মাওরি নারী

সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতারও পরিসমাপ্তি ঘটে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগেও বর্ব্বরজাতি সভ্যতাকে ঘৃণা করে ও ত্রাসের চোখে দেখে। তবে, জাপান শাসনে ক্রমশঃ

তাহারা মানুষ হইয়া উঠিতেছে। শহরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী বাড়িতেছে—সভ্যতারও ক্রম-বিকাশ হইতেছে। কানাকা, জাপান ও স্প্যানিশ—এই ত্রিত্বের সমাবেশে বৈচিত্র্যময় মাইক্রোনেশিয়া নূতন প্রেরণায় ও নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। জাপানের পতাকাতলে তাহারা বেশ সুখেই বাস করিতেছে। অনেক দ্বীপে কারাগার নাই—দেশবাসীরা অপরাধ কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না।

জাপান গবর্ণমেণ্টের অফিস পালায়ু দ্বীপে অবস্থিত। অরণ্যাবৃত দ্বীপ আজ শহরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শহরের জন-সংখ্যা—৫০,০০০ হাজার।

পালায়ু

জাপান-প্রবাসী বহুসংখ্যক পালায়ুবাসীরা এ-দ্বীপের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জে ৫০,০০০ হাজার আদিম অধিবাসী এবং ৪০,০০০ হাজার জাপানী বাস করে। ইয়াপ দ্বীপের লোক-সংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য দ্বীপে কমে নাই। বরং জাপানীদের দ্বারা মাইক্রোনেশিয়া ক্রমশঃ ভর্ত্তি হইয়া যাইতেছে। বিদেশীর আগমনে আমেরিকা হইতে ধীরে ধীরে যেমন রেড ইণ্ডিয়ানের অবসান হইয়া বিদেশী-দ্বারা সেদেশ ছাইয়া যায়। আমাদের আশঙ্কা হয়, সুদূর, অথবা অদূর ভবিষ্যতে

জাপানীদের দ্বারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জও পূর্ণ হইয়া যাইবে,—আদিম অধিবাসীরা লোপ পাইবে; শুধু ইতিহাসের পাতা তাহাদের অস্তিত্বের ক্ষীণ সাক্ষ্য প্রদান

পালাউর অধিবাসী

করিবে। বহু সংখ্যক দ্বীপ–যাহা মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের ৬ ভাগের ৫ ভাগ—তাহার প্রকৃত অধিবাসীর ভবিষ্যৎ অবস্থা ভাবিতেও গাত্র শিহরিয়া উঠে।

মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে ইক্ষুর চাষ খুব বেশী। এ-স্থানে পূর্ব্বে শস্য উৎপন্ন হইত না। সাইপাস, টিমিয়াস ও রোটা দ্বীপ হইতে বছরে এক কোটি (জাপানী ইয়েন) মুদ্রার চিনি রফ্‌তানী হয়। অধুনা, এখানে নানা জাতীয় ফলের গাছ রোপিত হইতেছে।

মারিয়ানা

ভিন্ন জল বাতাসের জন্য অনেক গাছ মরিয়া যায় বলিয়া চারা বাঁচাইয়া মাইক্রোনেশিয়ার সম্পদ বৃদ্ধি-মানসে জাপানীরা বিজ্ঞান-সম্মত উপায় অবলম্বন করিতেছে। পোনাপে দ্বীপে যে-সব ফল ও শাক-সবজীর গাছ আনা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা— ৩৮টি।

ট্রক, মার্শাল ও কুশায়ি দ্বীপের বাসিন্দারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী বলিতে পারে। কুশায়ি দ্বীপ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন নাবিকগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এইস্থানের অধিবাসীরা নিরীহ, সাধু-সুজন ও শান্ত প্রকৃতির। লোক-সংখ্যা —১২০০ শত।

ট্রক, মার্শাল ও কুশায়ি

ইয়াপ, ম্যাপ ও রুমং—এই তিনটী দ্বীপ কাছা-কাছি অবস্থিত। ইহাদের চতুর্দ্দিক প্রবালের দ্বারা সুরক্ষিত। দৈর্ঘ্যে ১৯ মাইল এবং প্রস্থে ৭ মাইল। ম্যাপ দ্বীপ অতি-

ম্যাপ ও রুমং

ক্রম করিয়া রুমং দ্বীপে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক।

কোন পর্য্যটক যদি মাইক্রোনেশিয়া দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অনুমতি লইতে হয়। তবে, জাপান-সরকার প্রায়শঃ কোন বিদেশীকে তথায় যাইতে অনুমতি দেন না। সাধারণতঃ এই বিরাট দ্বীপপুঞ্জকে তাঁহারা বিদেশীর দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে চান। বোধ হয়, কোন রাজ-নৈতিক কারণ নিহিত আছে। কেহ যদি নিতান্তই যাইবার আগ্রহ দেখায়, পারতপক্ষে তাহাকে ভড়কাইবার চেষ্টা করা হয়। সেখানে মৃত্যুভয় যথেষ্ট, লোকগুলি বর্ব্বর প্রকৃতির, তাহারা দস্যু, রাস্তাঘাট নাই, থাকার স্থান নাই প্রভৃতি বলিয়া পর্য্যটককে ভীত-সন্ত্রস্থ করিয়া তোলা হয়। মিঃ উইলার্ড প্রাইস নামক জনৈক মার্কিন ভ্রমণ-কারী কোনমতে নিরাশ না হইয়া অনুমতি পাইবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীকে পীড়াপীড়ি করেন। বহু সাধ্য সাধনায় তিনি ৪ মাস তথায় থাকিবার অনুমতি পান। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অতঃপর 'দি ন্যাশনাল জিওগ্রাফি-ক্যাল ম্যাগাজিন'-এ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যায় বাহির হয়। সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকৃতই চমৎকার,

অদ্ভুত ও বিচিত্রদেশের বিস্ময়কর কাহিনী। মাইক্রো, অর্থে ক্ষুদ্র। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক দ্বীপের সমষ্টি।
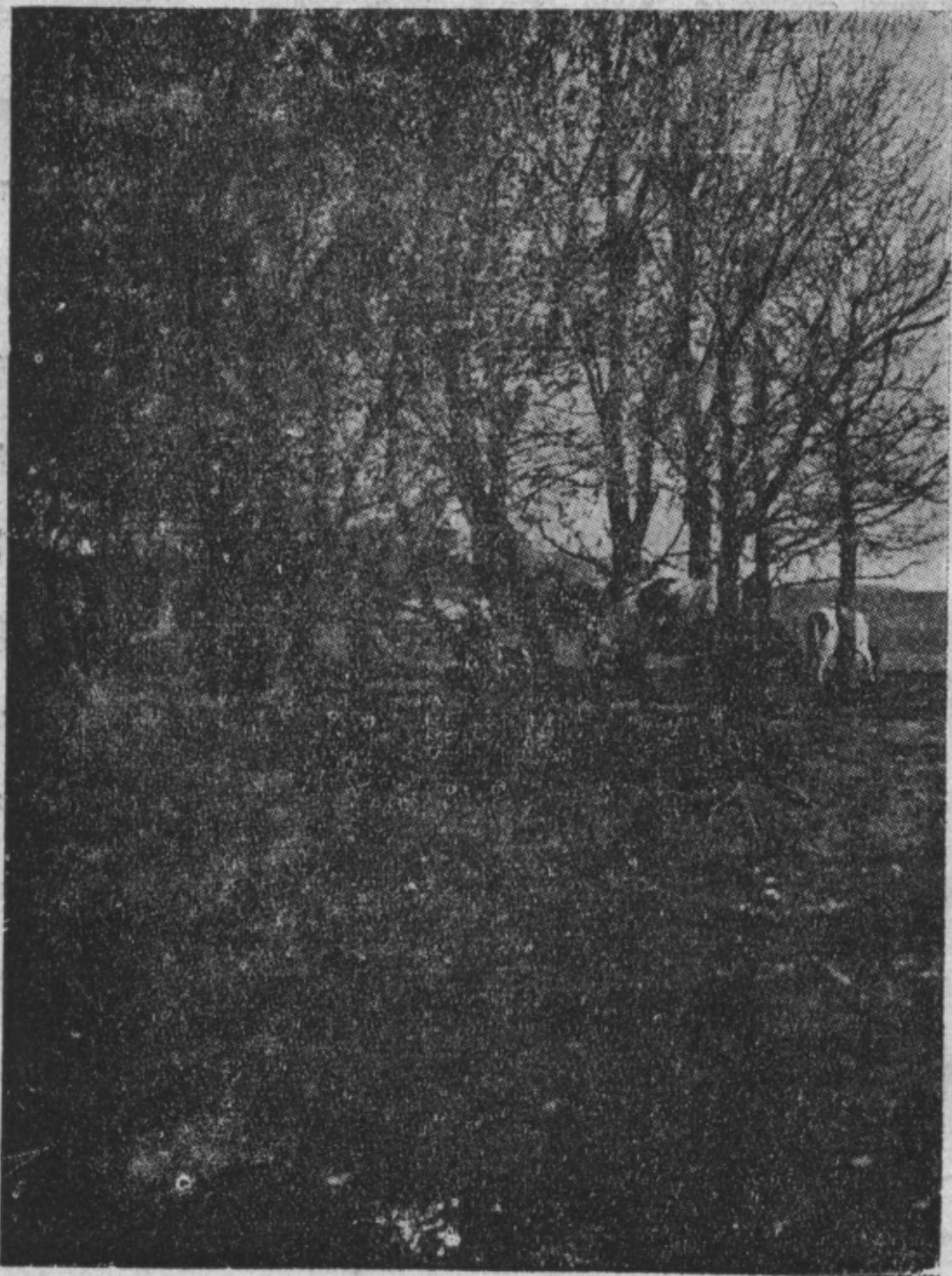
মাইক্রোনেশিয়ার অরণ্য-চিত্র

সমুদ্র বক্ষে ইহা পদ্মের মত ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে বলিয়া এই বিশাল দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ হইয়াছে

—মাইক্রোনেশিয়া। এই দ্বীপসমূহ ভ্রমণ করিয়া একজন তাহিতিয়ান কবি গাহিয়াছেন :

"The leaves are falling on the sand,
The sea shall swallow coral strand,
Our folk shall vanish from the land."

জাপান-শাসিত ফরমোসা, অতি সুন্দর দ্বীপ। প্রকৃতি-রাণী তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য এখানে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন। এখানকার নৈসর্গিক অক্ষয় সৃষ্টি-নৈপুণ্যের তুলনা নাই। এই সাগরময় দ্বীপের অফুরন্ত দৃশ্য-নিচয় যে দেখিয়াছে, তাহার চিত্ত আনন্দরসে ভরিয়া উঠিয়াছে। দ্বীপের প্রত্যেক স্বভাব-সৃষ্টির মধ্যে বিশ্ব-বিধাতার অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য বিরাজমান।

ফরমোসা

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজরা এই দ্বীপে আগমন করেন। তাঁহারা ইহার নামকরণ করেন—ইল্লা ফরমোসা বা (সুন্দর দ্বীপ)। তবে, ইতিহাসকার বলেন : চীনারা সর্ব্বপ্রথমে এই দ্বীপে আসেন এবং ইহার উর্ব্বরতাশক্তি, মনোহর সৌন্দর্য্য ও অপার্থিব বস্তুসমূহ দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময়-আনন্দে মাতিয়া উঠেন ; কিন্তু, অল্পকাল পরে তাঁহারা কোন বিশেষ অজ্ঞাত কারণে দ্বীপ ত্যাগ করিয়া

স্বদেশে চলিয়া যান। এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে আগত মালয় বলিয়া অনুমিত হয়। অধুনা, সর্ব্বদিক দিয়া ফরমোসা উন্নতিলাভ করিয়াছে।

ইহার প্রধান শহর—টাইহোকু বা টাইপেহ্। রাজপুরুষগণ এখানে অবস্থিতি করেন। তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় শহরের ক্রমোন্নতি হইতেছে। এখানকার রাজকীয় যাতুঘর অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। ফরমোসার অতীত দিনের শিল্পজাত দ্রব্য-সম্ভার, ফিলিপাইনের বস্ত্র ও কাষ্ঠ-শিল্প, জাপানের মৎস্য ধরিবার বিবিধ সরঞ্জাম, প্রাচীন যুগের অস্ত্র, অসভ্যজাতির প্রস্তুত নানাবিধ তৈজসপত্র, দেশ-বিদেশের জীব-জন্তুর মৃতদেহ, পুরাতন পুঁথি-সাহিত্য প্রভৃতি যাতুঘরে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। বৈদেশিকদের থাকিবার উপযুক্ত যথেষ্ট হোটেল শহরে বিদ্যমান। সুরম্য রাস্তায় বিবিধ যান-বাহনের গতিবিধি চমৎকার এবং এখানকার জল-প্রপাতের দৃশ্য অভুতপূর্ব্ব!

আফিম, ধান, খৈল, কেরোসিন, তুলা, তামাক, কাগজ, ঔষধ ইত্যাদি এখানে উৎপন্ন হইয়া দেশ-বিদেশে রফ্তানী হয়। এতদ্ব্যতীত, এখানে দেখিবার বহু জিনিস আছে, যাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। এখানে অনেক মুসলমান

বাস করেন—তাঁহাদের অনেকে মালয় ও আরব হইতে

ফরমোসার জল-প্রপাত

আগত। তাঁহাদের প্রভুত্ব এখানে নিতান্ত কম নয়। এখন আমরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কথা বলিব।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মালয় আর্কিপিলেগো বা পূর্ব্ব

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উত্তরদিকে বিস্তৃত। ছোট বড়

ফিলিপাইন

৭,০৮৩টী দ্বীপ লইয়া এই বিরাট দ্বীপ-রাজ্য গঠিত। ভূমির আয়তন—১,১৪,৪০০ বর্গমাইল এবং জন-সংখ্যা এক কোটির উপর; তন্মধ্যে, মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। ফিলিপাইন, পূর্ব্বে স্পেনের শাসনাধীনে ছিল। স্পেনের শাসনকর্ত্তা দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে এই দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ হয়—ফিলিপাইন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত ফিলিপাইনের যুদ্ধ বাঁধে এবং ফিলিপাইন পরাজিত হইয়া আমেরিকার শাসনাধীনে যায়। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্র ইহাকে স্বায়ত্বশাসন দিয়াছেন।

প্যাসিগ্ নদীর সম্মুখভাগে ম্যানিলা শহর অবস্থিত। ইহা স্পেন, মালয় এবং আমেরিকান্ শক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মিলন বলা যাইতে পারে। ইন্ত্রামুরোস্ (Intramuros) স্প্যানিশ্দের প্রাচীন শহর। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। নগরের চতুঃপার্শ্ব প্রায় আড়াই মাইল দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সব চাইতে পুরাতন স্যান্টেটোমাস্ বিশ্ব-বিদ্যালয়। ম্যানিলা গির্জ্জা, স্যান্টিয়াগো দুর্গ এবং গবর্ণমেণ্ট বিল্ডিংস্ আমেরিকার পতাকাতলে সুরক্ষিত।

এডমিরাল-ডিউ তাহার যুদ্ধ-জাহাজসহ ম্যানিলা উপসাগরে প্রবেশ করেন এবং স্পেন প্রভুত্ব ফিলিপাইনে নষ্ট করিয়া দেন।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্ত্তা বা গবর্ণর আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা তিনিই রক্ষা করেন। বাইশজন নির্ব্বাচিত সদস্য এবং দুইজন মনোনীত সদস্য লইয়া এখানে একটী আইন-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত আছে।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ম্যানুয়াল কুয়েজন (Manual Quezon) নামক এক কৃষকপুত্র এই দ্বীপপুঞ্জের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অর্দ্ধ এশিয়ায় এতদিনে একটী নূতন জাতির ক্রমোন্নতির পথ সুগম হইল। সম্প্রতি যুক্ত-রাষ্ট্রের আইন-সভা হইতে একটী নূতন বিল্ পাস্ হইয়াছে। তাহাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, এখন হইতে দশ বৎসর পরে ফিলিপাইন দ্বীপবাসীরা আমেরিকার শাসন-শৃঙ্খল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবে। আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্র ফিলি-পাইনকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে যে, পরবর্ত্তী চল্লিশ বৎসরের মধ্যে তাহারা তাহাদের নিজেদের দেশ সুন্দররূপে শাসন করিতে সমর্থ হইবে। এখানে কোনরূপ

বিদ্রোহ বা অশান্তি নাই। কারণ, আমেরিকার শাসন বা তাহাদের ব্যবসায় এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, ফিলি-পাইনবাসীদিগের স্বাধীনতার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় না। আমেরিকার দ্রব্য-সম্ভার বিনাশুল্কে

আধুনিকা ফিলিপাইন

ফিলিপাইনে আসে এবং এ-দেশের বাণিজ্য-সামগ্রীও সে-দেশে বিনাশুল্কে প্রবেশ করে।

আমেরিকা যখন ফিলিপাইন অধিকার করে, তখন, ইহা যুক্ত-রাষ্ট্রের একটী অংশ বলিয়া গৃহীত হয়।

এ-সমস্ত উদারতার ফলে কখনো শাসক ও শাসিতের মধ্যে অসন্তোষের ভাব দেখা যায় না। ইহা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বর্ত্তমান রাজধানী—ম্যানিলা। ইহা প্রাচ্যের মুক্তা-স্বরূপ। ম্যানিলা, আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্র ও পোতাশ্রয়। দ্বীপপুঞ্জের সব চাইতে বড় দ্বীপ···লোজোন। ইহা উত্তরে অবস্থিত থাকিয়া উপসাগরের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। ম্যানিলার প্রবেশ দ্বারে কোরেজিডোর (Chorregidor) দ্বীপ দাঁড়াইয়া। এই রহস্যজনক প্রাচীন দ্বারে পুয়েত্তারিয়েল (Puertareal) ল্যাটিন অক্ষরে যাহা লেখা আছে, তার ইংরাজী অনুবাদ এই ঃ

In the reign of King Charles III, wise king of Cappain and the Indian Josede Basco de-vargas, Governor of the Philipines in the zeal of or the honour of the city and for the protection of the citizens caused this royal gate to be carefully built in the year 1760.

কোরেজিডো দ্বীপ আমেরিকার অধীনে সব চাইতে সুরক্ষিত এবং সুশাসিত। ইহা আমেরিকার জিব্রাল্‌টার

বলিয়া অভিহিত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে মার্কিন শাসিত শহরগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং উন্নতিশীল।

একোইরিয়াম ও বিল্‌বিদপ্রেজন্ নামক স্থানে সুন্দর সুন্দর আস্‌বাবপত্র বিক্রয় হয়। ইহার অনতিদূরে ক্যাবা-ইট-এর নৌ-ঘাঁটি, লোজক্যানোস্‌-এর খনিজ প্রস্রবণ দেখার জিনিস। মোটর, অথবা, পদব্রজেও তথায় যাওয়া যায় এবং সন্নিকটে নারিকেল ক্ষেতের মাঝে প্যাগ্‌সো জানব্যাপিদ অবস্থিত।

এখনা এখানকার স্পেনীয় গির্জ্জায় প্রবেশ করিলে ফিলিপাইনবাসীদের জীবন-ধারার অনেক কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, তাহা বড়ই অভিনব এবং কৌতূহলোদ্দীপক!

ম্যানিলার ১৭৫ মাইল উত্তরে চির-সুন্দর বেগুই ও গ্রীষ্ম-নিবাস ভ্রমণ করা বড় আরামদায়ক। ট্রেণ, অথবা, মোটরযোগে বেন্‌গুইটের রাস্তা ধরিয়া তথায় পৌঁছা যায়। মোটরে ভ্রমণ সমাপ্ত করিতে দুইদিন লাগে। তাহার উত্তর দিয়া বহু কোম্পানীর লাইন প্রতিষ্ঠিত আছে। ডলার লাইন, দি নর্থ-জার্ম্মান, লয়েড প্রভৃতি জাপান, অথবা, চীনের পথে, আমেরিকা, অথবা,

ইয়োরোপের প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

ফিলিপাইনের সুন্দর কিশোর লেস্ পরিহিত সুন্দরী কিশোরী, বংশীবাদক ও তাহার মধুর সঙ্গীত স্পেনের বিজ্ঞ শাসক তৃতীয় চার্লস-এর রহস্যময় স্মৃতি আজিও মনের উপর স্পষ্ট রেখাপাত করিয়া যায়। বর্ত্তমানে এখানে ৬৩০ জন ব্রিটিশ-ভারতীয় বাস করেন।

পাসিগ্, লস্ব্যানস্, বাতাঙ্গাস্, ফিলিপাইনের অন্যান্য শহর অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ মুস্‌লিম মিস্‌নাও, সোলু, মান্দানু প্রভৃতি দ্বীপে বাস করেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রচারের ফলে, এই দ্বীপে ক্রমশঃ খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য অনুভূত হইতেছে। তবে, মুস্‌লিম সম্প্রদায় এখনো স্বধর্ম্মে দৃঢ়-বিশ্বাসী আছে। পালাও নামক স্থানের পাহাড়িয়াদিগকে খ্রীষ্টানগণ বহু প্রলোভন দেখাইয়াছে। তত্রাচ, তাহারা ভোলে নাই। মরোস্-সর্দ্দারগণ ইস্‌লামের মাহাত্ম্য স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুলে মুস্‌লিমদিগকে পড়িতে দেওয়া হইবে না বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছে; তাহারা মূর্খ থাকিতে রাজী, তথাপি, ধর্ম্মান্তর গ্রহণে রাজী নয়। বরং বহু ফিলিপাইনবাসী

অ-মুসলিম, ইস্‌লামের একচ্ছত্রী সাম্য ও ভ্রাতৃভাব দর্শনে মুসলমান হইতেছে।
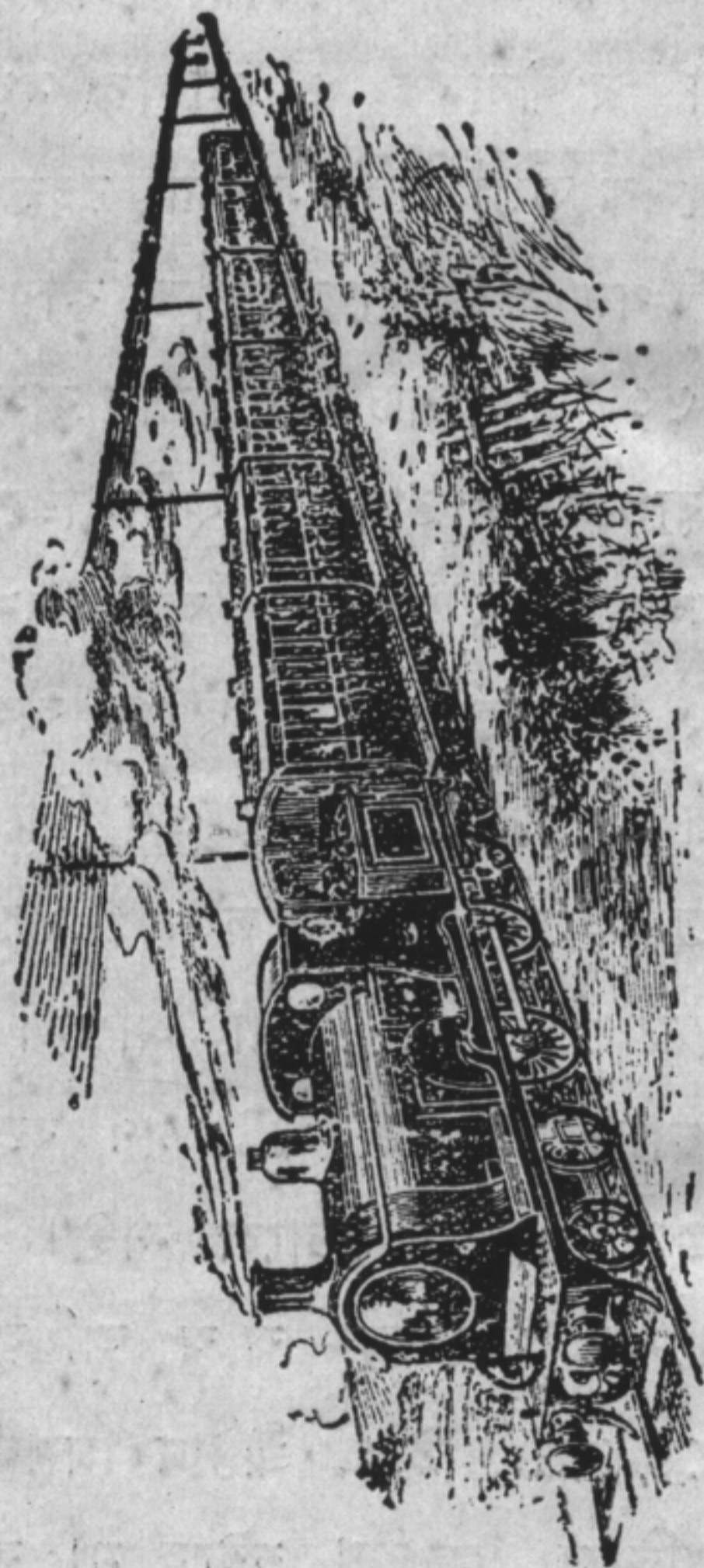
বোম্বাই হইতে ট্রেণ চলিয়াছে

ফিলিপাইনের অন্তর্গত মান্দানু একটী বৃহৎ দ্বীপ।

ইহার পরিধি প্রায়—৩৭,০০০ হাজার বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা প্রায়—৬,০০,০০০ লক্ষ ; তন্মধ্যে, তিন ভাগের দুই ভাগ মুসলমান। দেশের আদিম বর্ব্বর জাতিকে দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতি করিতে

মান্দাস্থ

মান্দাস্থ আগ্নেয়গিরি

দেখা যায়। এ-দ্বীপেও যথেষ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী আছে। এখানকার আগ্নেয়গিরি জীবন্ত ; হ্রদে নৌ-বিহার খুব আরামপ্রদ।

বহু শতাব্দী আগে মুসলিমগণ এই দ্বীপে আসিয়া

ইসলাম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। অনতিকালমধ্যে আশাতীতরূপে কৃতকার্য্য হন। অতঃপর, পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনীয়গণ এ-দেশে আসিয়া মুস্‌লিমদের সাফল্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া যান! তখন, মান্দানুবাসী মুস্‌লিমগণ ধনে, মানে, জ্ঞানে দেশের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী-জাতি।

মান্দানু হ্রদ

তখনকার যুগে মান্দানুর প্রায় প্রতি গ্রামে এক-একজন দলপতি থাকিতেন। কতকগুলি দলপতির উপরে একজন সুলতান বা কেন্দ্রীয় শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হইতেন। সেই সব সুলতানের বংশধর রাজ-শক্তি হারা

মান্দানু পোতাশ্রয়
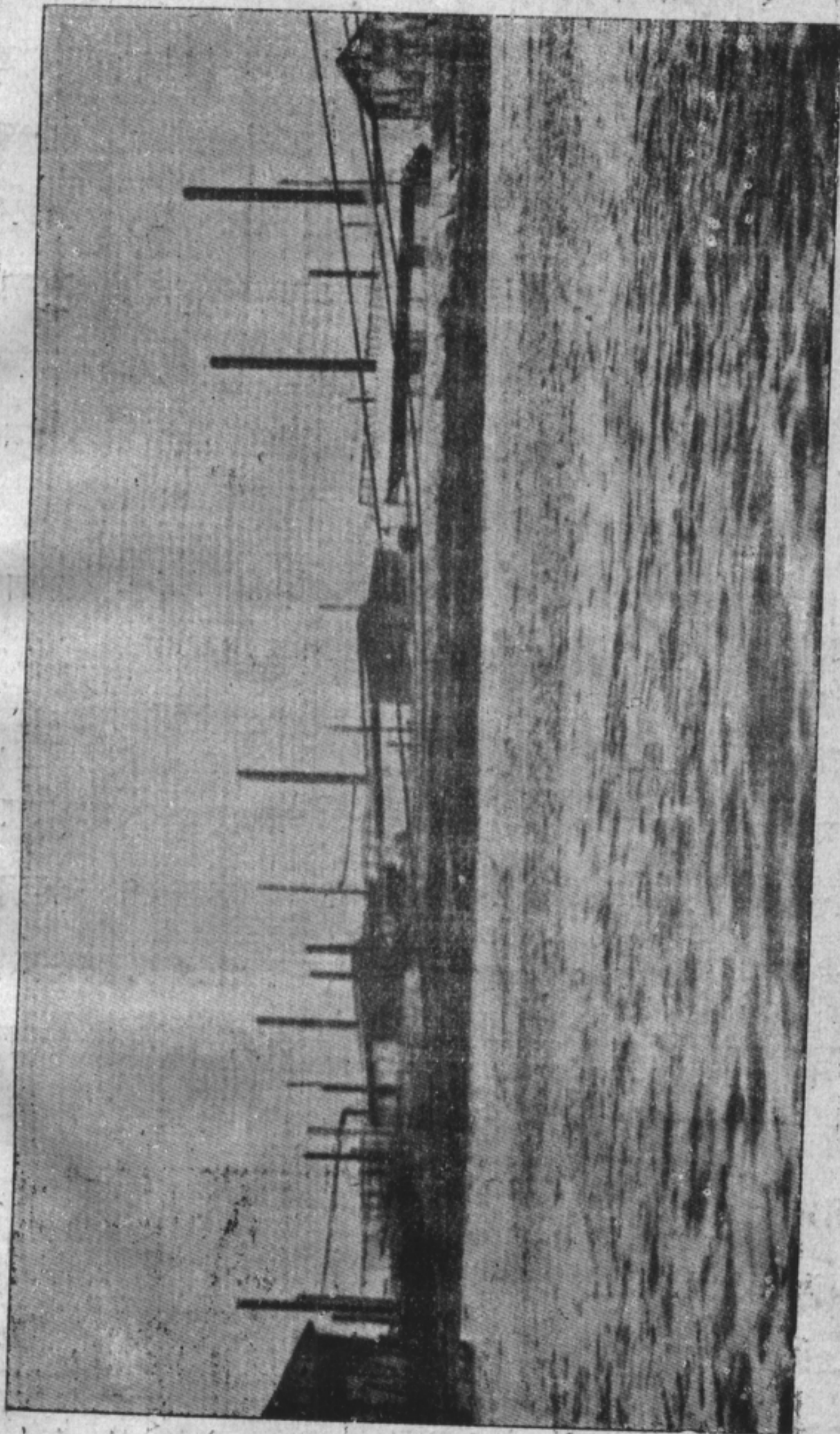
অবস্থায় আজিও বসবাস করিতেছে। স্পেনীয়গণ এ-দ্বীপে আসিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের প্রতাপ দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহাদের অসামান্য প্রভাবে ইস্‌লামী শাসন-তন্ত্র ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। অধুনা, কাহাকেও সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করিতে হইলে মার্কিন সরকারের অনুমতি লইতে হয়। মান্দানু, এখন মার্কিন-রাষ্ট্রের শাসনাধীনে।

মান্দানু দ্বীপে একটী অবৈতনিক বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বালক-বালিকাদের শিক্ষার নিমিত্ত বহুসংখ্যক স্কুল-কলেজও স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার মুস্‌লিম সম্প্রদায় ধর্ম্মভীরু ও নিষ্ঠাবান। মস্‌জিদে কোর-আন ক্লাস বসে। এমাম ও আলেমগণ বালক-বালিকাদিগকে খুব যত্নসহকারে বিশুদ্ধভাবে কোর-আন আবৃত্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন। কোর-আন পাঠকে ইঁহারা জিক্‌র করা বলেন। দেশের প্রাচীন ভাষার নাম—মরাণো। ইহা আরবী মিশ্রিত রাজভাষা। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই ভাষায় উচ্চশিক্ষা পাইয়া থাকে।

এই দ্বীপের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ঃ গম, ধান, ইক্ষু, নারিকেল, তামাক ও কলা। পেট্রোল, স্বর্ণ, রৌপ্য,

প্রশান্ত ও ভারত-মহাসাগরীর দ্বীপপুঞ্জের অবস্থিতি স্থানসমূহ
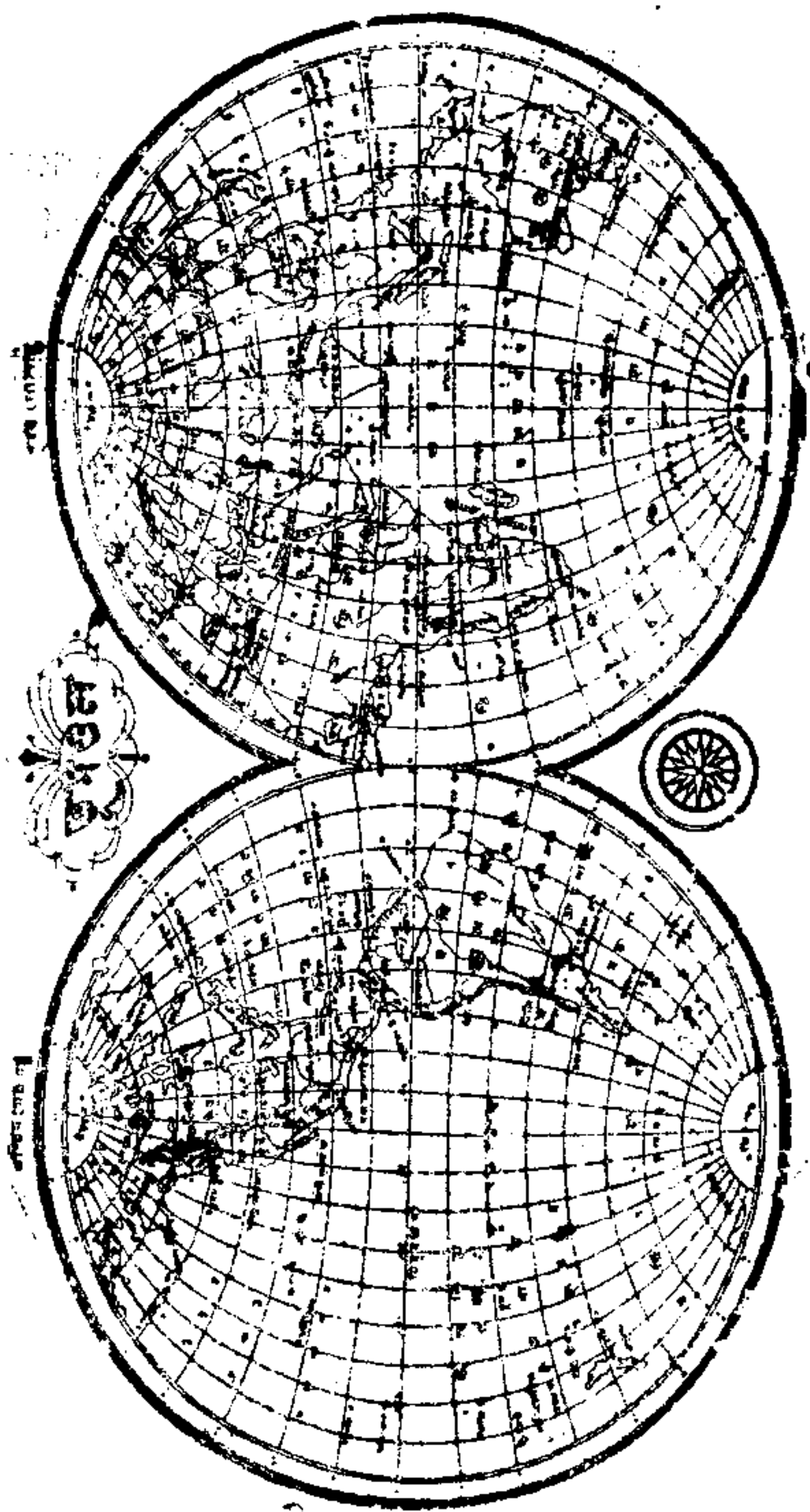
তাম্র, লবণ প্রভৃতি খনিজ-সম্পদ। খনিজ-সম্পদের ব্যবসায়—সাধারণতঃ চীন, জাপান ও আমেরিকার সহিত যুক্তভাবে চলে।

ফিলিপাইন-সমুদ্র, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতম। এইজন্য, ইংরাজীতে ইহাকে ফিলিপাইন-ডিপ Philipine-deep বলা হয় :

সমাপ্ত